আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

শ্রদ্ধাঞ্জলী

প্রঃ অমলেন্দু রায় সভাপতি (গভারনিং বডি)

প্রঃ দিলীপ চক্রবর্তী

প্রঃ ডঃ বিমল কুমার দত্ত

প্রঃ ডঃ স্বপন কুমার দাস

শিক্ষাকর্মী

সুকদেব দাস

তাপস কুমার দাস

ছাত্রী

সঞ্চিতা সরকার

'ভুলিবো না'

"...তোমার চরম মুক্তি, হে ক্ষণিকা, অকল্পিত পথে
ব্যাপ্ত হোক। তোমার মুখশ্রী-মায়া মিলাক, মিলাক
তৃণে-পত্রে, ঋতুরঙ্গে, জলে-স্থলে, আকাশের নীলে।
শুধু এই কথাটুকু হৃদয়ের নিভৃত আলোতে
জেনে রাখি এই রাত্রে— তুমি ছিলে, তবু তুমি ছিলে।"

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

২০০৫

ASUTOSH COLLEGE LIBRARY

৯২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৬
ফোন নং : ২৪৫৫ ৪৫০৪

উপদেষ্টা ঃ
অধ্যাপক ডঃ দেবব্রত চৌধুরী

উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ
শ্রী অমলকান্ত চক্রবর্তী, শ্রী মোহিনী মোহন আদক, শ্রী অশোক কুমার রায়, শ্রী অংশুতোষ খাঁ,
শ্রী রমেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমতী রাইকমল দাশগুপ্ত, শ্রীমতী চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, শ্রীমতী শ্রাবণী রায়
শ্রীভাস্কর মৃধা, শ্রীমতী সুধা গুপ্তা

যুগ্ম পত্রিকা সম্পাদক
শতরূপ ঘোষ
প্রিয়াঙ্কা মজুমদার

সম্পাদকমণ্ডলী
অরুণোদয় মৈত্র, শময়িতা চক্রবর্তী, অঙ্কুর দাশগুপ্ত,
প্রসেনজিৎ সাহা, অরিন্দম চক্রবর্তী
অতনু দাস

কর্মাধ্যক্ষ
অতনু দাস

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
ঋতব্রত ব্যানার্জী, কৌস্তভ চ্যাটার্জী, সজল বসাক, কৃষ্ণাঞ্জন ঘোষদস্তিদার, দেবমাল্য দাশগুপ্ত,
অনুমিত্রা ঘোষদস্তিদার, অরুণোদয় মৈত্র, অনুব্রত মজুমদার, রাণাপ্রতাপ সিং,
শময়িতা চক্রবর্তী, রিলামালা কিস্কু, সর্বজিৎ দে, অরিন্দম চক্রবর্তী,
প্রসিত ভট্টাচার্য, অঙ্কুর দাশগুপ্ত, অতনু দাস, প্রসেনজিৎ সাহা,
রাজীব গোস্বামী, শিবাজী মুখার্জী, পূর্ণেন্দু ব্যানার্জী
শুভজিৎ চক্রবর্তী, অদিতি চ্যাটার্জী

প্রচ্ছদ ঃ সুগ্রীব কুমার গায়েন

প্রকাশক ঃ অধ্যক্ষ ডঃ দেবব্রত চৌধুরী

মুদ্রক ঃ শিলালিপি, বাসব চট্টোপাধ্যায়
১৬এ টেমার লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ঃ ২২৪১ ৪৫৮০

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

বর্ষ : ২০০৪-২০০৫

সভাপতি
পার্থিব বসু
সহসভাপতি
রিলামালা কিস্কু
সাধারণ সম্পাদক
সর্বজিৎ দে
যুগ্ম সহ সাধারণ সম্পাদক
অনুজা ঘোষ
অরিন্দম চক্রবর্তী
যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক
অতনু দাস
অদিতি চ্যাটার্জী
যুগ্ম সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক
তমালিকা মজুমদার
ইন্দ্রনীল পোদ্দার
যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক
অনুব্রত মজুমদার
সঞ্জয় ঘোষ
যুগ্ম সহ ক্রীড়া সম্পাদক
সুমন সুর
কোয়েলি চ্যাটার্জী
জশত্বী সেন
যুগ্ম পত্রিকা সম্পাদক
প্রিয়াঙ্কা মজুমদার
শতরূপ ঘোষ
ক্যান্টিন সম্পাদক
সঞ্জয়কুমার মণ্ডল
কমনরুম সম্পাদক
রাজর্ষি সাহা
ছাত্রীকমনরুম সম্পাদক
শর্মিষ্ঠা রায়
ছাত্রাবাস সম্পাদক
প্রসেনজিৎ দাস
অন্যান্য সদস্য
রাণাপ্রতাপ সিং
দেবজিৎ ব্যানার্জী
অমিতরঞ্জন সেন

সূচীপত্র

সম্পাদকের কলম	শতরূপ ঘোষ	৬
সাধারণ সম্পাদকের কলম	সর্বজিৎ দে	৭
আশুতোষ কলেজ— কয়েকটি কথা	অধ্যক্ষ দেবব্রত চৌধুরী	৮
১৯০৫ এ বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ	অধ্যাপক অংশুতোষ খাঁ	৯
Globalization & Culture: Americanization or cultural Diversity?	Sukanta Acharya	১৩

Poetry

The Human bubble	Prof. Arundhati Chanak	১৮

কবিতা

স্বপ্নের ভালোবাসা	দীপজয়িকা ঘোষ	১৯
বধ্যভূমি-কিশলয়-ভবিষ্যত	সুমন্ত ভাণ্ডারী	১৯
আবার দোষাকর	মুনিয়া মিত্র	২০
প্রেম	অক্ষয় মুখোপাধ্যায়	২০
নীরব স্মৃতিচারণ	পলাশ কুমার হালদার	২১
অন্য বাঁচা	মলয় মৃধা	২১
বানভাসি	নাসরিন	২২
ধ্বংসস্তূপের চিঠি	নন্দন মুখার্জী	২২
স্বল্প পরিসর	শায়নী সাহা	২৩
"এ দেশের বুকে আঠেরো আসুন নেমে"	সোমরাজ ওহ	২৪
প্রাপ্তিযোগ	দেবাঞ্জন মুখার্জী	২৫
আশাপূর্ণা স্মরণে	সূর্যশুভ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬
সত্যিই কি মানুষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পেরেছে?	তাপস বিশ্বাস	২৮
কেদারনাথ-বদ্রীনাথের পথে	জয়দীপ ঘোষ	৩০
বর্ষবিনিদ্র রাত্রির একাকীত্বের সঙ্গী ?	সুস্নাত চ্যাটার্জী	৩৩
স্মৃতির মণিকোঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা কিছু মুহূর্ত	দেবদ্যুতি গুড়্যা	৩৬
এক জীবাস্ম জীবন		

সূচীপত্র

Poems

Conversation	Tapobrata	৩৭
Why	Anish Ayaz	৩৭
Time	Jaya Mondal	৩৭
Still Higher	Ananda Mitra	৩৭

Prose

Fashion— New Horizons	Sneha Priya Bhanja	৩৮
Try to Fly	Sneha Priya Bhanja	৩৯
The World Today	Md. Ishraq-ullah	৪০
The Life and Times of a Rockstar	Ranadev Purakayastha	৪২

Hindi

बावला मन	Pitamber Jha Azad	৪৪
मेरी अभिलाषा	Pitamber Jha Azad	৪৪
मेरी अभिलाषा	Sandip Kr. Yadav	৪৫
	Om Prakash Misra	৪৬
खुश नसीब	Rabindra Tiwari	৪৭
सुनामी	Tanveer Ahmed Khan	৫০
कवीता	Tanveer Ahmed Khan	৫১

সম্পাদকের কলম

ছাদ, Canteen, Common Room, রক, বিশুদার চায়ের দোকান, Union Room— আর এ সবের মধ্যে দিয়েই দেখতে দেখতে কেটে গেল আরো একটা বছর। গত বারোটা মাস নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে ঘটে গেছে এমন অনেক ঘটনা, যা চিরকালের জন্য ছাপ ফেলে গেছে মানবসভ্যতার ইতিহাসে।

২০০৪ সালের একেবারে শেষের দিকে পৃথিবীর বেশ কয়েকটি উপকূল জুড়ে ঘটে গেল ভয়াবহ সুনামি। কত লক্ষ মানুষ যে এতে প্রাণ হারাল, আরো কত মানুষ যে গৃহহারা, স্বজনহারা হয়ে পড়ল, তার ইয়ত্তা নেই। আরো একবার প্রমাণ হয়ে গেল যে প্রকৃতির রুদ্র রূপের কাছে মানুষ আজও কত অসহায়। But, there is a silver lining after every dark cloud. এক্ষেত্রেও, এই ভয়াবহ দুর্যোগের পরেই সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন ধর্মের এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে যেভাবে এই আর্ত অসহায়দের পাশে এসে দাঁড়াল, তাতে আরো একবার প্রমাণিত হল যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির শত চেষ্টা সত্ত্বেও মানুষের মন থেকে মনুষ্যত্বকে কোনোদিন মুছে দেওয়া যায় নি, যাবে না।

আফগানিস্থান এবং ইরাকের ওপর আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ধারা আজও অব্যাহত। হাজারে হাজারে নিরপরাধ মানুষের জীবনের বিনিময়ে একদিকে Mc Donalds আর Coca Cola-র বাজার ছড়ানো, আর অপরদিকে তেলের খনির বরাত পাওয়া— মার্কিনি অভিধানে এরই চলতি নাম বিশ্বায়ন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী আছে, স্বৈরাচারী রাজদণ্ড কখনো শেষ কথা বলেনি। বলেছে সাধারণ মানুষ। আর এই সাধারণ মানুষের সংগ্রামের উদ্দীপনায় একদিন এই ফ্যাসীবাদী আগ্রাসনের ধ্বজা মাটিতে লুটোবে— এই আমাদের প্রত্যয়।

নজর ফেরানো যাক আমাদের দেশের দিকে। বছরখানেক আগেই একবার আমাদের দেশের শিক্ষা পরিকাঠামোটাকে গৈরিকীকরণ করার যে প্রচেষ্টা চলেছিল, তা প্রতিহত হয়েছিল ২০০৪ এর লোকসভা নির্বাচনে। কিন্তু তারপরেও গত এক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার এবং Supreme Court এমন বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করেছে যা শিক্ষা পরিকাঠামোর পক্ষে ক্ষতিকর। এর মধ্যে সাম্প্রতিকতম হল Supreme Court এর একটি রায় যাতে বলা হয়েছে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ওপর সরকারী হস্তক্ষেপ সরিয়ে নেওয়া হবে। এর ফলে একদিকে যেমন এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার মান পড়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকছে, অপরদিকে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ইচ্ছেমত মাইনে বাড়িয়ে শিক্ষার অধিকারে কার্যত উচ্চবিত্তের একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপনের সুযোগ। শিক্ষার এই বাণিজ্যিকরণ নীতির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সারা দেশের ছাত্রসমাজ প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামীদিনে আশুতোষ কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও এই আন্দোলনে বরাবরের মতই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

আজ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যখন একটা সামাজিক দোলাচলের পরিবেশ, তখন সেই অস্থিরতার চিত্র ছাত্রসমাজের লেখনীতে ফুটে উঠবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাই একদিকে ক্ষমতালোভী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি ঘৃণা আর অপরদিকে ভালবাসাকে সম্বল করে বেঁচে থাকা— এই জীবনবোধটাই reflected হোক এই পত্রিকার প্রতিটা পাতায়, প্রতিটা লাইনে। এই আমাদের আশা।

শতরূপ ঘোষ
পত্রিকা সম্পাদক আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

সাধারণ সম্পাদকের কলম

কিছু জিনিস থাকে, যা হয়ত সময়ের সাথে সাথে বদলায় না বা আমরা বদলানোর চেষ্টাও করি না। সেই রকমই একটা হল আমাদের অর্থাৎ এই সংসদের পত্রিকার 'সাধারণ সম্পাদকের কলমে'। এই লেখার মধ্যে দিয়ে অনেক কিছুই বলার আছে কিন্তু স্থানাভাবের জন্য অল্পেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

২০০৪ সালের ১৮ই অক্টোবর, প্রিন্সিপাল রুমের সামনে লাল আবিরে মাখামাখি হয়ে জয়ের আনন্দে আমরা সবাই আপ্লুত। কিন্তু সাথে সাথে কাঁধের উপর এসে পড়েছিলো এক বৎসর সুষ্ঠ ভাবে সংসদ চালানোর সুবিশাল দায়িত্ব। জানি না সেই দায়িত্বটা কতটা সুষ্ঠভাবে পালন করতে পেরেছি। তবে এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি যে আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোন রকম ত্রুটি রাখিনি।

কলেজে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'সোশ্যাল' ও 'ফ্রেশাস'-এর মধ্য দিয়ে এক বিকল্প সাংস্কৃতিক ভাবনা তুলে ধরতে চেয়েছি। কারণ আমরা মনে করেছি যে ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে এটাই সেরা শ্লোগান, "When Politics determine your future, you should determine the politics." 'সোশ্যাল' এ 'ফ্রেসার্স'-এর বার্ষিক বাজেট থেকে কিছু অর্থ বাঁচিয়ে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলাম। আর তারই ফল স্বরূপ কোলকাতার মহানাগরিক শ্রীবিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়-এর উপস্থিতিতে আমরা ২০০ জন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দিয়েছিলাম। নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ছাত্র সংসদ পরিচালনার পাশাপাশি 'University Football Champion' হতে পেরেছি তবে ক্রিকেটে আশানুরূপ ফল করতে ব্যর্থ হয়েছি। শেষভাগে Cultural Compitition, Common room Compitition এবং Magazine প্রকাশনার ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে আমাদের ছাত্রসংসদের একটা বছর।

সর্বজিৎ দে

সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

আশুতোষ কলেজ— কয়েকটি কথা

দেবব্রত চৌধুরী *অধ্যক্ষ*

দেখতে দেখতে নব্বইটা বছর পার হ'য়ে শতবর্ষের আলোকের দিকে এগিয়ে চলেছে আমাদের এই ঐতিহ্যমণ্ডিত কলেজ। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম কলেজ হ'ল আশুতোষ কলেজ। প্রায় সমস্ত বিষয়েই এখানে অনার্স পড়ার সুযোগ রয়েছে। বিশ্বায়নের এই দিনে কলেজ ও তার চিন্তা ভাবনা কে আগামীদিনের প্রতিযোগিতায় সামনের সারিতে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। অনেক কিছু করা হয়েছে কিন্তু তা যথেষ্ট একথা বলা যায় না। আমাদের আরো অনেক কিছুই বাকী আছে যা আমার দৃঢ় বিশ্বাস— সকলের প্রচেষ্টায় করতে সক্ষম হব।

বিশেষ করে উল্লেখ যোগ্য যে কলেজে দুটি ছেলেদের হস্টেল থাকা স্বত্বেও মেয়েদের একটি হস্টেলের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বিভিন্ন বিষয়ে এম. এ. এবং এম. এস. সি কোর্স খোলার। কলেজের ইচ্ছা আছে এই দুটি কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ব্যাপক ছেলে মেয়ের চাকরি হওয়ার জন্য বি. এড কোর্সের প্রয়োজনিয়তা আছে। সেই দিকে চিন্তা করে আমাদের বি. এড্র কোর্স খোলারও উদ্যোগ নিতে হবে।

ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মান ভালো হওয়া স্বত্বেও এদিকে আরো নজর রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এবছর বি. এ., বি. এসসি. পরীক্ষার রেজাল্ট সকলেরই নজর কেড়েছে। এই মান মানকে ধরে রাখতে হবে এবং একে ক্রমশ উন্নত থেকে উন্নততর করতে হবে।

খেলাধূলায় কলেজ-এর নাম চিরকালই ভালোছিল। বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড়েরই ভবিষ্যৎ এখানে রচিত হয়েছিল। সেই ধারা আজও বজায় আছে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কলেজ তার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে।

আমরা অঙ্গিকারবদ্ধ যে আগামী দিনে শতবর্ষের আলোয় উদ্ভাসিত এই কলেজ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত-বর্ষের শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে।

১৯০৫ এ বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ

অংশুতোষ খাঁ *অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ*

১৯০৫ এর বসন্তে যাত্রা শুরু হয়েছিল এক তরুণের অচেনার অন্তরাল থেকে খ্যাতির সূর্যালোকে। এক দশকের মধ্যেই সে তরুণ পৃথিবীর সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানী হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসে আইজাক নিউটন ও চার্লস ডারউইনের পাশে তাঁর নাম চিরকালের জন্য খোদাই হয়ে রইল।

এই তরুণ অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ জার্মানীর উরটেমবার্গের উলম্ শহরে। ১৮৮৬ সালে মিউনিক নগরীর লুইপাল্ড জিমন্যাসিয়ামে তাঁর বিদ্যালয় জীবন শুরু হয় এবং ১৯০০ সালে সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে অবিস্থিত Federal Institute of Technology থেকে তিনি স্নাতক হন। পাঁচ বছর বয়সে আইনস্টাইনের পিতা তাঁকে একটি কম্পাস উপহার দিয়েছিলেন। সেটি তাঁর মধ্যে যে অদ্ভুত বিস্ময় তৈরী করেছিল, সে সম্পর্কে নিজের আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছিলেন, 'I was struck by the idea that something deeply hidden had to be behind things'; ১২ বছর বয়সে ইউক্লিডের জ্যামিতি নিয়ে লেখা বই পড়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, "Its lucidity and certainty made an indescribable impression upon me,"। কিশোর বয়সে আইনস্টাইনকে তাঁর পারিবারিক বন্ধু ম্যাক্স তালমুদ কান্টের লেখা বই The Critique of Pure Reason উপহার দিয়েছিলেন। দর্শনের সাথে আইনস্টাইনের সারা জীবনের অনুরাগের বীজ এখানেই প্রোথিত হয়েছিল।

স্নাতক হওয়ার পর আইনস্টাইন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পদলাভের জন্য বিস্তর আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কপালে শিকে ছেঁড়েনি। ১৯০১ সালের মাঝামাঝি সময় হতাশায় তিনি তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন, I have given up the ambition to get to a university; দুটি স্কুলে কিছু সময় ধরে অস্থায়ীভাবে শিক্ষকতার পর তাঁর বন্ধু মার্শেল গ্রসমানের বাবার সুপারিশে বার্নের পেটেন্ট অফিসে অস্থায়ী পদে যোগ দেন ১৯০২ সালে। ১৯০৪ সালে তাঁর চাকুরি স্থায়ী হয়।

এই পেটেন্ট অফিসে কর্মরত অবস্থায় ১৯০৫ এর ৯ই জুন ২৬ বছর বয়সী আইনস্টাইনের প্রথম গবেষণাপত্র 'আলোর উৎপাদন ও রূপান্তর বিষয়ে চূড়ান্ত দৃষ্টিভঙ্গী প্রসঙ্গে' জার্মানীর বিখ্যাত বিজ্ঞানগবেষণা পত্রিকা 'অ্যানালেন ডার ফিজিক' এ প্রকাশিত হল। এই গবেষণাপত্রটির জন্য ১৯২১ সালে আইনস্টাইনকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯০৫ এর ১৮ই জুলাই পূর্বোক্ত গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হল তাঁর দ্বিতীয় গবেষণা নিবন্ধ 'ব্রাউনীয় গতি সম্পর্কে', ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হল তৃতীয় গবেষণা নিবন্ধ 'গতিশীল বস্তুর তড়িৎগতিতত্ত্ব প্রসঙ্গে'— জন্ম নিল বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ এবং ২৭শে নভেম্বর প্রকাশিত হল চতুর্থ গবেষণাপত্র 'ভর ও শক্তির তুল্যতা সম্পর্কে'। ইতিমধ্যে ২৭শে জুলাই আইনস্টাইন ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন, Doctoral Thesis ১৯০৬ সালে ঐ একই গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯০৫এ মাত্র ছয় মাসের মধ্যে প্রকাশিত চারটি গবেষণাপত্র বিজ্ঞানের ধারণার জগতে যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে তাকে বৈপ্লবিক বলা বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নয়। তাই আইনস্টাইনের জীবনীকার আব্রাহাম পেইসের মন্তব্যটি অবশ্যই যথার্থ 'No one before or since has widened the horizon of physics in so short a time as Einstein did in 1905', সঠিক

কারণেই তাই রাষ্ট্রসংঘ ২০০৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ' হিসাবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

আইনস্টাইনের প্রথম গবেষণা নিবন্ধটি আলোক তড়িত ক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হার্টস লক্ষ্য করেন যে, সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর পৃষ্ঠে অতিবেগুনী রশ্মি আপতিত হলে, ঐ পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়ে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে। এই ঘটনাকে বলে আলোক তড়িৎ ক্রিয়া। আলোর যেহেতু ব্যতিচার, আবর্তন, সমাবর্তন ঘটে, সেই কারণে আলোকে তরঙ্গরূপে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সনাতন তরঙ্গ তত্ত্ব এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ হয়। ইতিমধ্যে বস্তু বিকিরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্স প্ল্যাংক কোয়ান্টাম তত্ত্বের ধারণা উপস্থাপিত করেন। আমরা জানি, সব উত্তপ্ত বস্তু থেকে শক্তি বিকীর্ণ হয় এবং কোন বস্তুর উপর বিকিরণ আপতিত হলে, ঐ বিকিরণের কিছু অংশ বস্তুটিতে শোষিত হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কির্সফ প্রমাণ করেন যে, সব বস্তুর ক্ষেত্রেই বিকিরণ ক্ষমতা ও শোষণ ক্ষমতার অনুপাত ধ্রুবক হবে এবং এই ধ্রুবকের মান হবে কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ ক্ষমতার সমান। কৃষ্ণ বস্তু বলতে আমরা সেই বস্তু বুঝি, যার উপর বিকিরণ আপতিত হলে, তাহা সম্পূর্ণভাবে বস্তুটিতে শোষিত হয়। এই ধ্রুবকের মান নির্ণয় করতে গিয়ে বিজ্ঞানী ভীন (Wien) যে সূত্রের প্রস্তাবনা করেন, দেখা যায় যে হ্রস্ব তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণের ক্ষেত্রে তাহা পরীক্ষালব্ধ ফলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যদিকে ১৯০০ সালে লর্ড র‍্যালে এবং জেমস জীনস্ যে সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করেন, দেখা যায় যে উহা দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্ল্যাঙ্ক কোয়ান্টাম তত্ত্বের অবতারণা করেন। আমরা জানি, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রক্ষিত কোনো ফাঁপা বস্তুর ভিতরের দেওয়াল (walls of a cavity) থেকে নির্গত বিকিরণ কৃষ্ণ বস্তু বিকিরণের ন্যায় আচরণ করে। প্ল্যাংক অনুমান করেন যে, দেওয়ালগুলি অসংখ্য ক্ষুদ্র দোলকের সমষ্টি এবং এই দোলকগুলি শক্তি বিকিরণ বা শোষণ করতে পারে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে। ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব প্রয়োগ করে তিনি কৃষ্ণ বস্তু বিকিরণের শক্তিঘনত্ব এবং ক্ষুদ্র দোলকগুলির গড় শক্তির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেন। দেখা যায় যে প্ল্যাংকের সমীকরণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু প্ল্যাংকের ভাবনার মধ্যে বৈপ্লবিক দিকটি হল যে, বস্তু থেকে যখন কোনো শক্তি নির্গত হয়, তখন তাহা নিরবচ্ছিন্নভাবে হয় না— বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি শক্তি প্যাকেট (যাদের বলা হয় কোয়ান্টা) রূপে নির্গত হয়। যদি বিকিরণের কম্পাঙ্ক f হয় তবে এক একটি প্যাকেটে বা কোয়ান্টায় hf পরিমাণ শক্তি থাকবে, যেখানে h কে প্ল্যাংকের ধ্রুবক বলা হয়।

প্ল্যাংকের তত্ত্বের এই বৈপ্লবিক ভাবনার তাৎপর্য সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন আইনস্টাইন। যেহেতু 'কোয়ান্টা' কল্পনায় পদার্থের তরঙ্গ এবং কণা উভয় রূপই নিহিত আছে, আইনস্টাইন তাই কোয়ান্টাকে ফোটন হিসাবে অভিহিত করেন।

আলোক তড়িৎক্রিয়ার ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে আইনস্টাইন ধাতব পৃষ্ঠে আপতিত আলোককে অসংখ্য ফোটনের সমষ্টি হিসাবে বিবেচনা করলেন। আপতিত এই ফোটনগুলির সাথে ধাতব পৃষ্ঠের ইলেকট্রনগুলির সংঘর্ষের সময় ফোটনগুলি ইলেকট্রনগুলিকে তাদের শক্তি প্রদান করে। এই শক্তির এক অংশ ধাতবপৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রনকে মুক্ত করার জন্য ব্যয়িত হয় এবং বাকী অংশে ইলেকট্রনগুলির গতিশক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। ১৯১৫ সালে রবার্ট মিলিকান আলোক তড়িৎক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয় করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, আইনস্টাইনের প্রস্তাবিত সমীকরণ থেকে আলোক তড়িত ক্রিয়ার সব কটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ১৯০৭ সালে আইনস্টাইন কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রয়োগ করে নিম্ন তাপমাত্রায় কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হন এবং ১৯১৭ সালে লেসারের তত্ত্বগত ভিত প্রতিষ্ঠা করেন, যদি ও লেসার আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৬০ সালে।

আইনস্টাইনের দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটি ব্রাউনীয় গতি সম্পর্কিত। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ব্রাউন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জলের মধ্যে ভাসমান পরাগরেণুর গতি লক্ষ্য করতে গিয়ে তার 'চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল ও নিরবচ্ছিন্ন গতি' লক্ষ্য করেন। কি কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে,

কেউ তার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। গ্যাসের গতীয় তত্ত্ব প্রয়োগ করে আইনস্টাইন ঘটনাটির ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই নয়, আইনস্টাইনের ব্যাখ্যা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করল যে, অনু-পরমানু কাল্পনিক নয়, এগুলির বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু আইনস্টাইনের প্রতিভার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে এই ঘটনায় পরীক্ষা দ্বারা কি নির্ণয় করতে হবে, সেটি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে। যেহেতু পরাগরেণুর অণুগুলির গতি সম্পূর্ণভাবে বিশৃঙ্খল, অতএব যে কোনো পরাগরেণুর অণুর লব্ধি সরণের মান শূন্য হবে, তাই নির্ণয় করা দরকার মটরশুঁটি দানার সরণের বর্গের গড়মান। গতিবেগ নয়, আইনস্টাইন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন গড় বর্গ সরণের দিকে এবং প্রমাণ করলেন যে, গড় বর্গ সরণের মান সময়ের সমানুপাতিক হবে। শুধু তাই নয়, এই পরীক্ষা থেকে লব্ধ যে কোন অণুর আকৃতি ও নির্দিষ্ট আয়তনে অণুর সংখ্যার (অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা) মান যে অন্যান্য পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ সেটিও পরিলক্ষিত হল।

আইনস্টাইনের তৃতীয় গবেষণাপত্র নিউটনীয় দেশ-কালের ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এল। নিউটনীয় বা সনাতন ধারণা অনুসারে দৈর্ঘ্য, সময় এবং ভর পরম রাশি এবং অপরিবর্তনীয়। নিউটনীয় ভাবনা অনুসারে, কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য কি পরিবেশে নির্ণয় করা হল, তার উপর নির্ভরশীল নয়। বস্তু গতিযুক্ত হোক বা পর্যবেক্ষক গতিযুক্ত হোক, দৈর্ঘ্যের মান সব অবস্থাতেই এক থাকবে।

নিউটনের মতে, সময়ও একটি পরম রাশি। দুজন পর্যবেক্ষক দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী সময় পরিমাপ করলে, সেই পরিমাপ পর্যবেক্ষকদ্বয়ের অবস্থান বা গতির উপর নির্ভর করবে না। সময় সর্বদা এক থাকবে। উপরন্তু একজন পর্যবেক্ষক যদি দুটি ঘটনাকে একই সময়ে ঘটতে দেখে, তবে অন্য একজন পর্যবেক্ষক ঘটনা দুটিকে একই সময়ে ঘটতে দেখবে— দ্বিতীয় পর্যবেক্ষকের অবস্থান বা গতি যাই হোক্ না কেন। তাই নিউটনের মতে সমকালীনতাও (simultaneity) একটি পরম ঘটনা।

নিউটনীয় ধারণায় ভরকেও অপরিবর্তনীয় হিসাবে গণ্য করা হয়; ভর বস্তুর গতির উপর নির্ভর করে না।

আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদে এই তিনটি মৌল রাশি সম্পর্কে সনাতনী ধারনার আমূল পরিবর্তন ঘটালেন। তাঁর মতে, দৈর্ঘ্য, সময় বা ভর কোনটিই পরম নয়— এগুলি আপেক্ষিক।

আইনস্টাইনের এই ভাবনা গড়ে ওঠার পিছনে উনবিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

হাইগেনস, ফ্রেনেল প্রমুখ বিজ্ঞানীরা যখন আলোর তরঙ্গপ্রকৃতির উপস্থাপনা করেন, তখন প্রশ্ন ওঠে যে, যে কোনো তরঙ্গের উৎপত্তি ও প্রগতির জন্য সর্বদা একটি মাধ্যমের প্রয়োজন, আলোর ক্ষেত্রে এই মাধ্যম কি হবে? সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়, অথচ সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে অনেক স্থানেই কোনো জড় মাধ্যম নেই। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পন্থা হিসাবে বিজ্ঞানীরা একটি কাল্পনিক মাধ্যমের (ইথার) অস্তিত্ব উপস্থিত করলেন— আপাতদৃষ্টিতে যে স্থান শূন্য মনে হবে, উহা শূন্য নয়— ইথার দ্বারা পূর্ণ। আলো, গ্রহ নক্ষত্র সব কিছুই ইথারের মধ্য দিয়ে অবাধে গতিশীল রয়েছে। এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা ভাবলেন যে, যদি সর্বব্যাপী ইথার স্থির থাকে এবং কোনো বস্তু ইথারের মধ্য দিয়ে গতিশীল হয়, তবে বস্তুর পরম গতি নির্ণয় করা সম্ভব হবে এবং পরম নির্দেশতন্ত্রের সন্ধানও পাওয়া যাবে।

এই উদ্দেশ্যে মাইকেলসন এবং মর্লি ১৮৮১ সালে একটি পরীক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন। বার বার পরীক্ষা করেও তাঁরা ইথারের অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজে পেলেন না।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় গবেষণাপত্রে আইনস্টাইন তাঁর অনুনকরণীয় সহজ যুক্তির উপস্থাপনের মাধ্যমে এই সমস্যাটির সমাধান করলেন। তিনি বললেন, আলোর গতিবেগ উৎস বা পর্যবেক্ষক বা মাধ্যমের গতির উপর নির্ভর করে না। পরস্পরের সাথে সমবেগ সম্পন্ন সব নির্দেশতন্ত্রেই আলোর গতিবেগের মান একই হবে। সেই সাথে তিনি পরম নির্দেশতন্ত্রের সাপেক্ষে পরম গতির ধারণা সম্পূর্ণ বর্জন করে বললেন যে, সব গতিই আপেক্ষিক এবং এই গতি পরিমাপ করতে হবে অপর একটি নির্দেশতন্ত্রের সাপেক্ষে যেটি গতিশীল থাকতে

পারে। এই বিশ্বে পরিমাপের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ সুবিধাভোগী (Privileged) নির্দেশতন্ত্র নেই এবং গতি নিরপেক্ষ যে কোন নির্দেশতন্ত্রে অবস্থিত সব পর্যবেক্ষকের কাছে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলি সত্য এবং একই রকম হবে। এই দুই স্বীকার্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠল বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ, যেখানে দেশ (Space) এবং কাল (Time) একই ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হল এবং কাল্পনিক ইথারের অস্তিত্ব অনাবশ্যক বলে পরিত্যক্ত হল।

সনাতন ধারণা অনুযায়ী, ভর এবং শক্তি দুটি পৃথক ভৌতরাশি। চতুর্থ গবেষণাপত্রে আইনস্টাইন এই ধারণাটিরও পরিবর্তন ঘটালেন। তিনি দেখালেন যে, v গতিবেগে গতিশীল কণার ভর m হলে, কণাটির মধ্যে mc^2 পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত থাকবে যেখানে c হল শূন্যে আলোর গতিবেগের মান। নিউক্লীয় শক্তি পরিমাপের ক্ষেত্রে এই সূত্রটিকেই গণ্য করা হয়।

আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ জড়ত্বীয় বা সমবেগসম্পন্ন নির্দেশতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই ধারণাকে প্রসারিত করে অজড়ত্বীয় বা ত্বরণযুক্ত নির্দেশতন্ত্রের ক্ষেত্রে ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন উপস্থাপিত করলেন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ। ১৯১৯ সাল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় নির্ণীত ১২টি তারা থেকে নির্গত আলোর অভিকর্ষক্ষেত্রে বক্রতা এবং অভিকর্ষ ক্ষেত্রে রক্ষিত যে কোন আলোক উৎসের লোহিত সরণ (Red shift) থেকে প্রমাণিত হল আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের যথার্থ্য এবং সাথে সাথেই আইনস্টাইন বিজ্ঞানীদের মধ্যে মহানায়কের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

আইনস্টাইন সারা জীবনে প্রায় তিনশটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র মহাবিজ্ঞানী হিসাবে নয়, তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ মানবতাবাদী। তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন, "A hundred times every day I remind myself that my inner and outer life are based on the labours of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving."

আইনস্টাইন মনে করতেন যে, মানবজাতির কাছে মূল সমস্যা হল "the world was promised freedom from want, but large parts of the world are faced with starvation, while others are living in abundance." আইনস্টাইনের মতে, "The economic anarchy of capitalist society as it exists today is, in my opinion, the real source of evil," কারণ "the entire production is carried for profit, not for use. The technological progress produces an army of unemployed, rather than in easing of the burden of work for all." আইনস্টাইন তাই দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন, "I am convinced there is only one way to eliminate these grave evils, namely through the establishment of a socialist economy, accompanied by an educational system which would be oriented towards social goals."

আইনস্টাইন সারা জীবন যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত করেছিলেন। হিরোসিমা-নাগাসাকির বীভৎসতা তাঁকে তীব্রভাবে বিচলিত করেছিল, ১৯৫৪ সালে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের পর পৃথিবীর আর একজন অসাধারণ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক বারট্রাণ্ড রাসেলের সাথে আইনস্টাইনের আবেদন প্রকাশিত হল, যা 'রাসেল-আইনস্টাইন ম্যানিফেস্টো' নামে অভিহিত হয়। এই ইস্তাহারে বলা হল, "আমরা চাইলে শান্তি, জ্ঞান, বৈদগ্ধের অবিচ্ছিন্নতা অগ্রগতি আমাদের সামনে। কলহ ভুলতে পারি না বলে এ সবের বিকল্প হিসেবে আমরা কি মৃত্যুকে বেছে নেব? আমরা মানুষ হিসেবে আবেদন রাখছি মানুষের কাছে— বাকি সব ভুলে গিয়ে মনুষ্যত্বের কথাই মাথায় রাখুন। তা যদি পারেন তো নতুন স্বর্গের রাস্তা আপনাদের সামনে খোলা। না পারলে, বিশ্বজনীন মৃত্যুর ঝুঁকি।"

মানবতাবাদী অসাধারণ এই বিজ্ঞানীর জীবনাবসান ঘটে ১৯৫৫র ১৮ই এপ্রিল।

Globalization & Culture : Americanization or Cultural Diversity?

Sukanta Acharya *Reader*

Everybody from a small town knows about the "Wal-Mart effect." The superstore— or a similar mega-retailer moves into a community and, within a few years, mom-and-pop hardware stores, toy stores and other main street retailers are put out of business. Whether that's a good or bad thing is up for debate.

Some argue that the smaller stores go under because Wal-Mart offers a bigger selection of goods at low prices. Consumers benefit because they can do all of their shopping at one place, and save money in the process. Detractors say consumers get less choice, and that because stores like Wal-Mart are international chains, they buy goods at an international level, and so local producers of goods suffer too, and soon entire communities lose their identity to mega corporations. We've become a "Gap nation", they say.

Opponents of globalization fear that the Wal-Mart effect is taking place on a global level, too. They cringe when a McDonalds franchise opens up in the historic heart of Prague, or when public spaces in Latin America, China or Africa become littered with billboards and advertisements for Coca-Cola, Nike and Calvin Klein.

Globalization's advocates say that free trade and free markets don't dilute or pollute other cultures, they enhance them. Trade creates wealth, they say. Wealth frees the world's poorest people from the daily struggle for survival, and allows them to embrace, celebrate and share the art, music, crafts and literature that might otherwise have been sacrificed of proverty.

So who's right? Is globalization killing non-western cultures, or is it augmenting and enhancing them?

Who Shot J. R.?

The idea that American culture is encroaching on the rest of the world is not a new one. Richard Pells writes in the *Chronicle of Higher Education* that, as early as 1901, Briton William Stead published a book with the foreboding title The Americanization of the World. The 1904 World's Fair in St. Louis, MO was billed as a celebration of the 100th anniversary of the Louisiana Purchase. The fair ignited overseas anti-American backlash, however, when exhibits instead tended to celebrate an alleged American cultural, political, and even ethnic supremacy.

More recently, fears that American culture might usurp the rest of the world could be traced to the marxist social critic Herbert I. Schiller. Schiller's breakthrough book, *Communication and cultural Domination*, was published in 1976, and was a critique of the post World War II influx and influence of American corporation across international borders.

In the mid-1980s, the debate again heated up when the dramatic series Dallas gained enormous popularity outside the United States. The show's mass appeal seemed to validate many of Schiller's theories, and sparked "cultural preservation" movements in Europe.

But as Ph.D. candidate Christopher Hunter points out in a paper presented to the International Insstitute of Communications, more recent studies have shown that the world-wide appeal of Dallas may have been more the result of the show's ability to draw on the unique characteristics of disparate cultures than a "lowest common denominator" appeal that effectively "dumbed down" cultures the world over. Hunter writes :

...a number of ethnographic studies showed that foreign cultures "read" the show in vastly different ways. Ien Ang (1985) found that Dutch women interpreted the programme through their own feminist agenda in opposition to the supposedly embedded message of patriarchy. Eric Michaels (1988) showed how Australian Aboriginals reinterpreted Dallas through their notions of kinship in a way quite contrary to the show's intended meaning. Finally, Liebes and Katz (1990) found very different cultural interpretations of the show among Arab, Jewish, American, and Russian viewers. Further, Liebes and Katz point out that Dallas failed miserably in Japan and Brazil, a seemingly unexplainable event given the supposedly overthelming power of U.S. content to bowl over other cultures.

Pell's Chronicle of Higher Educations essay makes a similar point : that where U.S. culture has been successful in generating trans-national appeal, it's perhaps the result of America's own diverse, immigrant population, which is able to produce entertainment, products and services that naturally appeal to a wide array of taste and demand. Pell suggests that's something to be celebrated, not admonished. "In the end, American mass culture has not transformed the world into a replica of the United States,"Pell Writes. "Instead, America's dependence on foreign cultures has made the United States a replica of the world."

McWorld

Perhaps the most influential essay on the west's "cultural imperialism" in the last twenty yeras was written by Benjamin Barber in a 1992 issue of the Atlantic Monthly. Entitled "Jihad vs. McWorld," Barber's article argued that most of the third world was either being commercialized by the west, or was being won over by radical Islam. Neither scenario, Barber wrote, was conducive to democracy or to development. "McWorld" became a catchphrase for the ubiquity of American corporations overseas, and Barber later wrote a book by the same name.

Conventional wisdom suggests Barber is right, and that there is an increasing anti-McWorld backlash in the developing world. Wherever there's anti-American sentiment, it seems, a McDonlds inevitably gets vandalized. When U.S. forces began bombing campaigns in Kosovo and Afghanistan, McDonalds franchises in those regions were the targets of protests.

But other suggest that highly publicized attacks on American corporate franchises might be anomalous. Dr. James L. Watson edited a book entitled *Golden Arches East*, which looks at how the establishment of McDonalds franchises has affected communities in Asia. Dr. Watson believes the anti-McDonalds fervor exists among just a few upper-class activists and academics, that the vitriol for American logos overseas is overstated in the media, and that most middle and lower-class communities are happy to have the added culinary options of a McDonalds or a Pizza Hut.

In most communities, in fact, the McDonalds has conformed to local culture, not not the other way around. The McDonalds corporation notes that most all of its overseas franchises are locally owned, and thus make efforts to buy from local communities. McDonalds also regularly alters its regional menus to conform to local tastes. McDonalds in Egypt, for example, serve a McFelafel. Japan McDonalds serve "seaweed burgers." Indian McDonalds don't serve beef at all. And some French McDonalds serve rabbit.

Watson points out that in the countries he's studied, McDonalds has been

"Asianized" more than Asia has been "supersized".

Michael Chan is the chairman of a group of Hong Kong fast food restaurants called "Café de' Coral." In an interview with Radio Netherlands, Chan said the introduction of McDonalds and it unique methods of distribution and labour management provided a template for other, indigenous restaurants in the country to flourish.

Logos— "No" or "Pro?"

Another important voice in the globalization vs. local culture debate is that of Naomi Klein. Klein's book *No Logo* has become the anti-globlization primer for activists all over the world. It was described by the New York Times as "the anti-globalization movement's Bible."

Klein's book posits that logos and corporate trademarks have become a kind international language, and that their omnipresence in the third world has robbed many peoples of the chance to develop a distinctive culture. She laments the ever-shrinking supply of "unmarked public spaces", and argues that corporations today spend far too much time branding and expend far too little resources on, for example, poor labor conditions, or on bettering the communities where they've exported their manufacturing plants.

But a recent study by communications expert at the University of Buffalo suggests that, at least when it comes to the internet, western cultural influence is waning, not expanding. George A. Barnett says that despite its centralization and apparent domination by the west, the Internet has given distinct "civilization clusters" a vehicle to communicate more effectively and promote their respective interests. Other communication experts have also suggested that emerging media (the Internet, and satellite television, for example) might serve as a megaphone for voices from smaller economics. The Arab-language al-Jazeera television station is one example. Most experts also predict that Chinese will surpass English as the Internet's predominant language in just a few years.

There are other signs that western "culture hegemony" might be a bit overstated, too.

For example, European anti-globalization activists have long criticized Hollywood and its bigbudget studios for monopolizing the world movie industry and, consequently, polluting other cultures with American iconolatry.

But according to a worldwide 1999 BBC poll, the most famous movie star in the world isn't Ben Affleck or Julia Roberts, but Amitabh Bachchan, an Indian film star probably unfamiliar to most Americans.

Last January, the New York Times reported that even American television programming has begun to lose its appeal overseas. Reason magazine writer Charles Paul Freund notes that as of 2001, more than 70% of the most popular television shows in 60 different countries were locally produced. And an article in the British newspaper The Guardian last year points out that the topgrossing movies for 2002 in Japan, Germany, Spain, France and India weren't U.S. imports, but were produced domestically.

The story is the same across the arts— movies, television, and literature— American pop culture exports may be well-known overses, but as emerging economics develop, consumers naturally prefer entertainment produced by artists with whom they share common experiences.

In his book *Creative Destruction*, economist Tyler Cowen also explains how music— perhaps the most accessible and identifiable sphere of a given peoples' cultural heritage— is almost always the result of cross-cultural influences.

Cowan writes that Trinidad's steel band ensembles, for example, "acquired their

instruments— fifty-gallon oil drums— from the multinational oil companies." Cowen also points out that all of the Third World's musical hubs— Rio, Lagos, Cairo, etc.— "are heterogeneous and cosmopolitan cities that welcomed new ideas and new technologies from abroad."

Even raggae, perhaps the most renown musical genre associated with a particular culture, was the result of cultural trade and influence. Cowen writes that ragge emerged when migrant Jamaican sugar workers traveled to the American south and brought back with them a jones for African-American rhythm and blues. Ragge developed over the 1950's as Jamaicans picked up radio broadcasts from New Orleans and Miami.

And yet for all of this western influence, Cowan still finds that developing countries still hunger most for music made at home. In India, domestically produced music makes up 96% of the market; in Egypt, 81%, in Brazil, 73%.

Wealth and Culture

Globalization's advocates argue that wealth invigorates culture, and that trade and access to international markets are the best way to create wealth. They point out that the Internet, for example, has given developing peoples all over the world a low-cost way of bringing crafts, textiles, and art to western consumers.

In his book *In Defence of Global Capitalism*, Swedish author Johan Norberg argues that because of emerging technology, developing countries that quickly embrace borderless trade can make the leap to western world living standards in a fraction of the time in once took. "Development which took Sweden 80 years to accomplish," Norberg writes, "has been successfully reiterated by Taiwan in 25."

As an example, Norberg cites an anecdote from the World Bank : Halima Khatuun is an illiterate woman in a Bangladeshi village. She sells eggs to a dealer who comes by at regular intervals. She used to be compelled to sell at the price he proposed, because she did not have access to other buyers. But once, when he came and offered 12 taka for four eggs, she kept him waiting while she used the mobile phone to find out the market price in another village. Because the price there was 14 taka, she was able to go back and get 13 from the dealer. Market information saved her from being cheated.

Norberg notes similar cases across the world, where villages in developing countries have pooled resources for mobile phone services, or Internet access, always with similar results.

The Internet in particular is fast becoming the most effective way for developing peoples to get their goods to market quickly, avoiding many of the usual overhead costs of maintaining a business. It's also a convenient way around trade barriers and tariffs. Consequently, websites promoting African, Latin America and indigenous American goods are popping up all over the Web.

The wealth from access to markets, then, enables developing people to make the shift from sustanance economic to merchant economics, a transition that enables art and culture to flourish. There's little time for culture, globalization advocates point out, when you're scrambling for survival.

The late economist Peter Bauer spent most of his life studying how trade can move developing economies from poverty to prosperity. Bauer recognized in the mid-20th century that those developing countries with significant contact with western markets were also the countries showing the most economic promise and growth.

In his book *From Subsistence to Exchange*, Bauer wrote, "Contacts through traders and trade are prime agents in the spread of new ideas, modes of behavior, and methods of production. External commercial con-

tacts often first suggest the very possibility of change, including economic improvement."

What's more, free traders point out that many times the merging of western and developing cultures often infuses new life and creativity into generations-old customs and traditions.

In addition to music, Cowen cites in his book several other examples in his book of great artistry from indigenous peoples that, in fact, was largely inspired by cross-cultural trade. Cowen cites the famed soapstone sculptures of the Canadian Inuit, which, Cowen writes "weren't practiced on a large scale until after World War II," when the practice was introduced to them by western artist James Houston. Cowen writes :

Analogous stories are found around the world. The metal knife proved a boon to many Third World sculpting and carving traditions, including the totem poles of the Pacific Northwest and of Papua New Guinea. Acrylic and oil paints spread only with Western contact.South African Ndebele art uses beads... that are not indigenous to Africa, but rather were imported from Czechoslovakia in the early nineteenth century. Mirrors, coral, cotton cloth, and paper— all central materials for "traditional" African arts— came from contact with Europeans.

Cowen and like-minded globalists believe, then, that far from stifling indigenous culture, free trade has exposed it to new influences, and opened it to new avenues of creative exploration.

Where to From Here?

Opponents of globalization argue that the playing field isn't level. Free trade naturally favours larger economies, they say, and so the predominant western influence stiflies the cultures and traditions of the developing world. Free traders argue that globalization enhances culture, and that, in any event, culture can't thrive in poverty. Both sides generally agree that subsidies, tariffs and other protectionist policies by developed countries against goods commonly produced in the third world (textiles, for example) hamper both culture and economic growth there.

With the onset of the Internet, satellite technology, cable television, and cellular and wireless networks, the biggest traditional barrier to global trade— distance— isn't much of a problem anymore. The Internet also makes import tariffs, another traditional barrier, more difficult to enforce.

One thing is certain : as we move forward, transnational trade will only become more frequent, and will continue to find new participants in new corners of the globe.

And activists on both sides will continue to debate whether or not the intermingling of cultures and influences that will inevitably accompany the growing global marketplace is a good or bad thing for both the developed and developing world.

The human bubble

Prof. Arundhati Chanak

Where were you, then,
Might Man?
Maker of space-shuttle
and bulletproof-Van?

Where were you, then,
when the oceans rose?
Why could not you predict
a calamity so close?

In front of Nature,
and her limitless wrath,
all your force and prowess,
faded away as forth.

Not belittling your
achievements galore,
or your attempts to control Nature,
and the elements four.

The 'Tsunami' however,
in its stripe,
has punctured much of your glory
as if with a spipe.
It has played havoc in wanton,
without reason or rhyme,
And has burst your pride
without caring a dime.
Now your soul salvation
lies on reconstruction,
in overcoming destruction,
with your flow of compassion.
Forget your failure,
against Nature's fury.
Lift yourself above Nature,
in nursing injury.
Only your acts of kindness,
of tending the tired,
of adopting the orphan,
and of aiding the impaired,
can get you rescned
from near-nihility,
and place you
atop the pinnacle of eternity.

স্বপ্নের ভালোবাসা

দীপজয়িকা ঘোষ *বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ*

সেদিন বাঁকা কাস্তেটা
মিট্ মিট্ করছিল জানলায়,
তুমি বললে তারা;
ও বললো ভুল,
ওরা বললো ভাঙ্,
তোমরা বললে কবি,
তিনি বলেছিলেন যন্ত্রণা...
তাঁরা বলেছিলেন বিপ্লব,
তুই বললি ধুতরো!
তোরা বললি অসহ্য,
সব চুপ;
তাই বললাম, ভালবাসা...

বধ্যভূমি-কিশলয়-ভবিষ্যত

সুমন্ত ভাণ্ডারী *পদার্থবিদ্যা সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ*

ফাটধরা, অপোক্ত মাটির দেওয়াল,
আর পাতার ছাউনি
ঘরের কোনে তেল বাতির একটু আলো—
একা লড়ে যাচ্ছে— ঘোচাতে—
কালো রাত্রি হয়তও বা কালের রাত্রিও।
বেস ক্যাম্পের দূরবীন লাগানো চোখগুলোতে
ধরা পড়ছেনা অথবা পড়েও পড়ছে না!
—তবুও বারান্দার সবুজ শুকনো কাপড়
পত্ পত্ করে উড়ছে।
সদ্যপ্রসবা কুমারীর যন্ত্রণা ক্লিষ্ট প্রসন্ন মুখ
ঐ আলোতেও উজ্জ্বল।
ভাবছে কি প্রথম দেখাবে— তার হৃদয়ের কণাকে;

তার প্রথম দিনের ভূ-স্বর্গের প্রভাত
নাকি উঠোনের ঝরা পাতা গাছের
নতুন পাতাগুলোকে—
যারা তার সাথে জন্ম নিয়েছে।

ক্লান্ত, অসাড় শরীরটাকে তবুও সে টেনে নিয়ে যায়
উঠোনের গাছটার কাছে— হেলান দিয়ে দাঁড়ায়—
গাছের কচি পাতাগুলো শিশুটির মাথায়
আলতো স্পর্শ করে বলে—
'দ্যাখ দ্যাখ, আমাদের জন্য আবার ভোর হচ্ছে'।

ভোরের নীরবতা হঠাৎ চমকে ওঠে—
বুলেটের নিষ্ঠুর শব্দে
...তারপর আবার নীরবতা—

প্রভাভরের প্রথম প্রভা—
শিশুটির মাথা ভেদ করে পড়ে
থেঁতলে, মিশে যাওয়া কচি কিশলয়ের উপর
হয়তবা ওদের ভবিষ্যতের অন্ধকার ঘুচিয়ে দিতে।

'ওহে আস্তিক, দয়া করে প্রশ্ন কোর না—
কারণ— এটাই বধ্যভূমি,
এখানে নবাঙ্কুরের কোন ভবিষ্যত নেই'।।

আবার দোষাকর

মুনিয়া মিত্র *বাংলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ*

ম্লান হয়ে আসা সেঁজুতি জানান দ্যায়
রাত বাড়ছে—
রাতের কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমায়
রাতের পৃথিবী।
স্বপ্ন দ্যাখে— প্রথম রাতের স্বপ্ন— নীল স্বপ্ন রঙ
এ্যাকটা কোরে সেঁজুতি নিভে যায়,
রাত বাড়ছে যে...
ছায়াবৃত্তের এ্যাকপাশে স্বপ্ন রঙ নিশান
পত পত কোরে ওড়ে।
আর অ্যাকপাশে
মণিপুরে নগ্ন মিছিলে ধূলো ওড়ে,
বুলেট বিদ্ধ কৌমার্য থেকে টপটপ করে ঝরে তাজা রক্ত।
রাতের শরীরে চাপে ধূলার চাদর।
রঙিন স্বপ্ন ঘুড়ি আকাশে ওড়ে।
হাড়ের কাঠামোয় চামড়া ঝুলিয়ে বুভুক্ষু আমলাশোল
মাথা দ্যায় ক্ষুধার যূপকাষ্ঠে,
রাতের গায়ে গোঙানীর পরত
দীপ নিভছে— রাত বাড়ছে।
নিশ্চিন্তে ঘুমন্ত পৃথিবীর
পরিধি কমতে কমতে অ্যাক বিন্দুতে দাঁড়ায়।
সাথে প্রায় নিভে আসা শেষ প্রদীপ;
স্বপ্ন ঘুড়ি মাঝ আকাশে ভোঁকাট্টা
ধরমর কোরে উঠে বোসে
দু'হাতে আড়াল কোরে
অন্তিম দীপটিকে জ্বালাবার শেষ চেষ্টা পৃথিবীর—

প্রেম

অক্ষয় মুখোপাধ্যায়
সাম্মানিক পদার্থবিজ্ঞান, তৃতীয় বর্ষ

আমি অনেকরকম ভাবে প্রেম কল্পনা করেছিলাম
অনেক রকম ভাবে...
শুনেছিলাম নিঃসঙ্গতায় প্রেম আসে,
হয়ত অসাড় অলসতায়—
যাক, সে কথা থাক, কেবল প্রেমের কথাই বলব আমি
অথবা ছবির কথা, প্রেমের ছবি—
ছবিটাকে অনেক রকমভাবে এঁকে নিতে পারো তুমি
ফাঁকা পীচ রোদে নির্ভেজাল দুটি বন্ধুর মধ্যে
হঠাৎ জড়িয়ে আসা প্রেম,
অবশ্যই একটি ছেলে, অন্যটি মেয়ে
নিতান্তই আধুনিক বহিরঙ্গে, কিন্তু যদি কল্পনা করি
তারা ভাবছে কাজিরাঙার অরণ্যে একটা হরিণের সাথে
বর্ষাভেজা ঘাসবনের হাওয়ায়
আরেকটা হরিণের গন্ধের মাখামাখি।
নাঃ, ঠিক হল না, নেহাতই বুনো
আরও ভাল হতো যদি একটি পাখি থাকতো;
আকাশ থাকতো আর পাখিটার এক সুন্দর নাম থাকতো
আর পাখিটার শিসে এক মন কেমন করা ডাক থাকতো
তবেই হয়তো প্রেম হতো
অথবা প্রেমের মতো গন্ধ, বর্ণ, অস্তিত্ব নিয়ে এক ফুল
যে ফুল থাকতো খোঁপায় অথবা হাতে
যে ফুলে অছিলায় অপাঙ্গে একবার দেখে নেওয়া যেতো
তার মুখ, তার চোখ অথবা পুরো তাকেই,
বেশ হতো, তাই না
তবে তুমি হয়তো ভাবছ, অভিসার নেই, উন্মাদনা নেই
আকুতি নেই, অশ্রু নেই এ কেমন প্রেম?
তবে যেতে হবে দূরে—
যেখানে প্রেয়স ভাস্কর লালিমায়
মন্দাকিনীর পবিত্র জলে অপরূপ আল্পনা সৃজনে রত,
যেখানে মাঙ্গলিক সুর বাতাসে অণুরণন তুলেছে,
অভিসারে চলেছে দেবযানি, কণ্ঠে শোভিত পারিজাত মালা
স্বর্গীয় সুষমাময় বৃক্ষতলে মিলন—
কচের ওষ্ঠধর প্রেয়সীর ললাটে এঁকে দিচ্ছে প্রেমের প্রথম বার্তাখানি।

নীরব স্মৃতিচারণ

পলাশ কুমার হালদার
বি এস সি, প্রথম বর্ষ, ভূগোল (অর্নাস)

আমি বসন্তের বুক চিরে
ফিরিয়ে আনব—
আমার ফেলে আসা 'অতীত স্মৃতি'!
যা শীতের সঙ্গে ঝরে গেছে—
প্রত্যহ! শিউলির মতো... নিঃশব্দে।
কোন পড়ন্ত বিকেলের—
মৃদু কিরণছটার... স্পষ্ট অন্ধকারে।
নতুবা শরতের কোন আনন্দদায়ক সন্ধ্যায়!
সেই অস্পষ্ট আওয়াজ—;
যার শেষ কথাটা
শুধু পরিচিত ঝাউয়ের বনেই
শেষ হয়েছিল—
চিরতরে...।
তার প্রত্যক্ষসাক্ষী—
ঐ ফুলেমোড়া কৃষ্ণচূড়া,
রঙীন প্রজাপতির দল;
আর উদাস নীলাকাশ!
আমি তাই প্রতিটি নিঃস্তেজ বিকেলে—
সেই গাছতলায় বসি,—
ভাবি, আর স্মৃতিচারণ করি
একান্ত একাকীত্বতায়।...

যখন ক্লান্তিকর সন্ধ্যা—
আমার লজ্জা নিবারণে
নিয়ে আসে একমুঠো
গাঢ় অন্ধকার...
আমার চেতনা হয়।
অপ্রাপ্ত ক্ষুণ্ণ হৃদয় মৃদু
সান্ত্বনা দিয়ে,
আমি ফিরে আসি, লঘুপদে—
আমার স্পৃহাহীন কুঠিরে।
আমি জানি—
আমার প্রিয়া...
চিলের বেশে
হয়তো বা একদিন দেখবে,...
আমি, সেই গাছতলায় বসে— একা;
নীরব স্মৃতিচারণে মগ্ন...।।

অন্য বাঁচা

মলয় মৃধা *বি.এ. প্রথম বর্ষ, সংস্কৃত (অনার্স)*

জানি একদিন
আমি থাকবনা;
অবিনাশী স্মৃতিটুকু রবে শুধু পড়ে,
তোমাদের এই চেনা ঘরে।
বহুদূর হতে আর
আমার এই চেনা স্বর
আসবেনা কভু ফিরে
তোমাদের এ দুয়ারে।
হবে না প্রতিধ্বনি
আমার জীবনীখানি;—
রবে না কোথাও লেখা,
হবে না কাগজে আঁকা,
তবু যদি নাহি মুছি;
মরণের ইতি খুঁজি;
অমৃত নাহি দিলে
ধূপের গন্ধ ঢেলে,
শুধু যেন আমি নেই,
হেথা নেই, হোথা নেই,
কোথা নেই, তবু আছি—
তোমাদের-ই মন জুড়ে।

বানভাসি

নাসরিন *ইংরাজী (সাম্মানিক) দ্বিতীয় বর্ষ*

উদয়াস্ত বাস্তুহারা
আমি বানভাসি,
মুহুর্মুহু ধসে,
ভাঙে মন।
আকাশ ভাঙা
বৃষ্টি চোখে,
দৃষ্টি ঝাপসা হয়,
উদ্বাস্তু আমি সারাক্ষণ।
ভিটে-মাটি-মন,
গিলছে সব
বৃষ্টি অঝোরধারে,
ভাঙা ঘরে
অন্ধকারের বাস।
মনের ঘরে
আশার শ্রাবণ,
চাতক চোখে চেয়ে,
অপেক্ষায় আছে বারোমাস।
উদয়াস্ত বাস্তুহারা
উদ্বাস্তু আমি,
বৃষ্টি চোখে সৃষ্টি করি হাসি,
—বৃষ্টির কবিতা ভেবে
ভুল করলি বুঝি?
আমি, তোকে ভালবেসে বানভাসি।।

ধ্বংসস্তূপের চিঠি

নন্দন মুখার্জী *বিজ্ঞান বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ*

বৈধের গণ্ডি পেরিয়ে পা রেখেছি অবৈধে,
বুঝতে শিখেছি একান্ত নিবিড় সম্পর্ক।
মানুষের সঙ্গে মনুষ্যত্বের, বীরের সঙ্গে বীরত্বের
চিত্তের সঙ্গে চরিত্রের কিংবা পাষাণের সঙ্গে পাষাণত্বের।

অঘ্রাণের হলুদ গন্ধ মেখে শিশির মঞ্চে
আসেন কেউ; গায়ে রংদার জোব্বা, মুখে
কিছু বিরক্তির ছাপ, চাউনিতে বাহবা
নয়, ঘৃণা; চেতনার ধ্বংসস্তূপে আলো জ্বলে।

সিগারেটের কটু ধোঁয়ায় কবিতাকুসুম ওড়ে
তারারা আনমনে ভাবে সূর্যের সাথে বন্ধুত্বের কথা।
সুসংবাদ উঠে এসো....
ছড়ানো ছিটানো অন্ধকার থেকে উঠে এসো আজ।

মেঘে মেঘে ঘর্ষণে জেগে ওঠে ছবি ও বিদ্যুৎ
শরীর কাঁপে, আরো কিছু চাই, যেন বা
বুকের থেকে ঝরে পড়ছে রক্ত, শরীরে
ঘূর্ণী হাওয়া ওঠে, নিজের নিজের মত
চলতে থাকি আমরা, দেখতে পাই হঠাৎ
উড়ন্ত মরালের গ্রীবায় ঝুলে আছে
আমার গত জন্মের অসমাপ্ত চিঠি।
না, আর নয়, এবার আমি আর আমার
সম্পর্কের ভিত, সব শেষ।
আমি আসি আজ; হারিয়ে যাই
অন্ধকারের অন্তরালে...।

স্বল্প পরিসর

শায়নী সাহা *বাংলা সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ*

প্রতি রাতে ঝগড়ার পর এক খাটে শুতে হত
গরমের ঘামে, আর গরম মাথার চাপে,
রোজই বলত ওরা, খাটটা বড্ড ছোট।
আর এভাবে শুতে পারবনা—
প্রতিদিনের, দৈন্যতার, অনুভূতি নিয়ে,
প্রতিদিনের স্বপ্নকে, নিজে হাতে শেষ করত ওরা।
ছোট খাটেও, যথাযথ দূরত্ব বজায় রেখে শুত—
সেদিনও তুমুল ঝগড়ার পর, রাতের শোয়া—
খাটটা যেন আরো ছোট লাগছিল, "দুজনেরই"
পেটে বাসী রুটি আর ডাল জানাচ্ছিল "সঙ্গী চাই"
হঠাৎ ঝড়ের আভাস পেয়ে চাঁদটা,
নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছিল।
পাশাপাশি শুয়ে, হঠাৎ মনে হোল খুব কাছে ওরা—
বেশী নড়াচড়া বুড়ো খাটটার সহ্য হবে না!!!
তবুও ওরা সেদিন হাজার ঝগড়ার মাঝেও,
না ছুঁতে চেয়ে, ছুঁয়েছিল একে অপরকে,
ছোট খাটেরই তখন অনেক প্রশস্ত পরিধি—
স্বপ্নের করাঘাত শুনেই, দরজাটা খুলেছে ওরা—
বাসি রুটি, আর ডাল, পাশাপাশি ভালই আছে।
চাঁদও এখন নিরাপদ আশ্রয়ে!!!
সবশেষে দুজনেই স্বীকার করেছে—
"ভাগ্যিস খাটটা ছোট ছিল???

"এ দেশের বুকে আঠেরো আসুক নেমে"

সোমরাজ গুহ *কেমিস্ট্রি (সাম্মানিক), প্রথম বর্ষ*

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।"

সামাজিক অন্যায়, শোষণ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর জন্য এই ছিল ছাত্র-যুব সমাজের প্রতি কবিগুরুর আহ্বান। সাড়াও পেয়েছিলেন। পরাধীনতার অন্ধকার সেদিনের তারুণ্য শক্তিতে ভরপুর ছাত্র-যুব সমাজকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। কিন্তু স্বাধীনতার আটান্ন বছর পড়ে আজ সেই সাড়া ক্রমশ ক্ষীণ। যদিও সমাজে শোষণ বিশ্বজুড়ে বিরাজ করছে সাম্রাজ্যবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা। সমাজের এই দুর্দিন আমরা দেখেও দেখি না। আসলে দেখার সাহস পাই না। কারণ আমরা আজ 'কেরিয়ারিস্টিক'। আমরা বাংলা পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাওয়ার জন্য খাতায় কোটেশান দিই "আমরা শক্তি, আমরা বল/ আমরা ছাত্র দল।" কিন্তু এর মানে কোন দিন আত্মস্থ করতে পারিনা। সম্যক জ্ঞান আমরা কোনদিন লাভ করিনি। আর পাঁচটা পুঁথিগত শিক্ষার মতো এই শিক্ষাও আমাদের বই খাতার পৃষ্ঠায় মুখ গুমরে কাঁদে।

অতীতের ছাত্র-যুব আন্দোলনের উজ্জ্বল মুহূর্ত আমাদের অক্ষমতাকে আরও নগ্ন করে তোলে। ষাটের দশকে ইতালি, স্পেন, ব্রিটেন, জার্মান, জাপান, পর্তুগাল, পশ্চিমবার্লিন, তুরস্ক ও বহু লাতিন আমেরিকার দেশে ছাত্র-যুব আন্দোলনের অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কাজ ও শিক্ষার অধিকারই হল এই সংগ্রামের মূল ভিত্তি। অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও গিনির তরুণরা মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও বোভেশিয়ার তরুন দেশপ্রেমিকরা বর্ণবৈষম্যমূলক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে।

ভারতবর্ষে বৃটিশসাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই-এর ডাক দিয়েছিলেন ভগৎ সিং, সুখদেও, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্লচাকী-রা। ১৯২৮ সালের সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্র-আন্দোলন ও তৎ-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ঐক্যবদ্ধ ছাত্র-আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

এহেন দুর্দান্ত শক্তি কি একেবারে মুছে গেছে? না। এই ঘোর অন্ধকারেও তাদের পদধ্বনি শুনি। যা ক্রমশ জোড়ালো হচ্ছে। এরা সংখ্যায় কম, কিন্তু অপরাজেয়। প্রাচীনপন্থীরা এদের "ছাত্রানাং অধ্যায়নাং তপঃ" বলে আটকে রাখতে চাইছে। কিন্তু সে বাঁধাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে এরা জোড় সাওয়াল করছে "Study and struggle" এর পক্ষে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এরা 'জেহাদ' ঘোষণা করেছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এরা শ্লোগান তুলেছে, "দাগো দাগো কামান দাগো, পেন্টাগনে কামান দাগো।" হ্যাঁ, এ কামান গর্জাবে। যেমন ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় 'আরোরা' জাহাজ থেকে জারের উন্টার-প্রাসাদ লক্ষ্য করে গর্জে উঠেছিল কামান। সুচনা হয়েছিল এক শোষণহীন স্বপ্নের সমাজের। শুধু দরকার আরও বারুদের। এ বারুদ আর কিছুই নয়। এ বারুদ কবি সুকান্তের 'আঠেরো বছর বয়স"। এ বারুদ হলাম আমরা। তাই যেন আমাদেরই ইঙ্গিত করে এদের আহ্বান—

"এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে"

প্রাপ্তিযোগ

দেবাঞ্জন মুখার্জী *বাংলা বিভাগ, ৩য় বর্ষ*

"নাম না জানা নদীটার ডান দিক ধরে কিছুটা হাঁটলে পাবে একটা ধানক্ষেত, সেই ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গেলে এসে পড়বে— করিমপুরে—

না না এই গল্প করিমপুরের নয়, তবে করিমপুরের এক ভিখারীকে নিয়ে।"

—"কি কাণ্ড! রাজা নয়, গজা নয়, প্রজা নয়, এমন কি বাঘ, ভাল্লুকও নয়, শেষে ভিখারীকে নিয়ে নাকি গল্প, ভিখারীদের আবার গল্প হয় নাকি বাপু?! সে তো ভারি আশ্চর্য্য!"

—"আচ্ছা, শোনোই না...! নদীটা বলে।

"...ভিখারীটারও নাম ছিলনা, ওদের তো নাম থাকে না, ওর তিনকূলে ছিলোনা কেও; কিন্তু নাম না জানা নদীটারও তো দুইকূল আছে; মাঝে মাঝে ভিখারীটা এসে বসতো তারই এককূলে।"—

—"আমি জানি, আমি জানি, আমি..." বাতাস ফুট কেটে যায় বয়ে,

—"আঃ! বলতে দাও, তো... একদিন সেই ভিখারী এসে বসে নদীর কূলে, এসে কত কথা বলে, বলে আর কাঁদে, বলে কিনা খেতে পায়নি গত দু'দিন ধরে, ভিক্ষা পায়নিতো"

—"আহা!" বলি আমি। নদী বলে—

—"কি কষ্ট! বলতো?! আমি বললাম সকলের কষ্টের দিন যায় কেটে।।

—"কেটে যায়, কেটে যায়... রাত কেটে যায়..." রাতজাগা বাদুড় বলে উড়ে যায়।

—"তারপর কি হল শুনি"

—"তারপর দিন সে পেল পুরো একটা টাকা ভিক্ষা!"

—"তারপর সে তোমার পাশে এসে বসলো বুঝি।"

—"বসলো না... বসলো না... ব...স...লো না..." রাতের অন্ধকার গাঢ় হয়ে বলে ওঠে।

—"হ্যাঁগো তাই, মুখপোড়া ভিখারীটা ঐ টাকাটা নিয়ে বসল ঐ মুখপুড়ী শ্যাওড়া গাছটার নীচে..."

—"তোমার রাগ হল বুঝি খুব?"

—"হলো তো বটে, তারপর কি হল জানো? মুখপোড়াটা ঐ একটাকাটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল, তখনই পড়ল ওর হাত থেকে ঐ টাকাটা গড়িয়ে পড়ল শ্যাওড়া গাছটার নীচের এক গর্তে!'

...আর ঐ মুখপোড়া বোকাটা ঐ গর্তে হাত দিয়ে তুলে আনতে গেলে ঐ টাকাটা।

—"তারপর, পেলোনা?"—

—"তারপরের দিন সকালের আলোয় দেখা গেল ঐ ভিখারীটার শরীরটা শক্ত হয়ে আছে, আর হাতটা ঢুকেই আছে ঐ কালকেউটের গর্তে!!"

—"ওটা বুঝি সাপের গর্ত্তো ছিল বুঝি!!"

—"হ্যাঁ গো! সবাই যখন ওর শরীরটা টেনে তুললো, তখনও ওর হাতের শক্ত মুঠোয় ধরা ছিল ঐ টাকাটা।"

—"আহা!"— আমি বলি।

—"আহা!" 'আহা!"— "আহা!"—

বলে বাতাস, আকাশ বলে, বলে রাতের আঁধার।

চুপচাপ থাকে নাম না জানা নদীটা।

আশাপূর্ণা স্মরণে (দশম প্রয়াণ বার্ষিকী স্মরণে)

সূর্যশুভ বন্দ্যোপাধ্যায় *বি.এ. (ইংরাজী সাম্মানিক), ২য় বর্ষ*

কোনও কোনও ভাষাতে কখনো কখনো এমন এক এক জন শিল্পীর দেখা পাওয়া যায় যাঁদের কথা ভাবলে আমরা অবাক না হয়ে পারিনা। বাংলা সাহিত্যে আশাপূর্ণা দেবী বোধহয় তেমনই একজন শিল্পী। যাদের ধারণা যে প্রকৃত শিক্ষার আলো অর্জিত হয় কেবল মাত্র বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের মধ্যে, তাদের চিন্তা ধারার এক বিরল ব্যতিক্রম সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী। স্কুলে ভর্তি না হয়েও যে শিক্ষার সোপানে পা রাখা যায় এই কথাটাকে তিনি আরও একবার প্রমাণ করে দিয়েছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম হয়েছিল পুরোনো কলকাতার এক অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারে; যেখানে মেয়েদের বাইরে যাওয়ার উপর ছিল কঠোর নিষেধাজ্ঞা। পরবর্তী কালে তিনি ছিলেন পর্দানশীন কুলবধূ যিনি কেবল মাত্র কৈশোর অতিক্রম করে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু সংসার তাঁর পায়ে কোনওদিনই শেকল পরায়নি, বরং হাতে তুলে দিয়েছে কলম। মায়ের মুখে শোনা গল্প-কবিতাই তাঁর অন্তরের অন্তরালে সাহিত্য সৃষ্টির বীজ বপন করেছিল। কিন্তু পরিবারের বাইরে গিয়ে নয়, ভেতর থেকেই তাঁর যা কিছু সৃষ্টি। দিন যতো গেছে, ভারতীয় নারীর সংসার ধর্ম যাকে বলা হয়, সেই ধর্মপালন করতে করতে তিনি হয়ে উঠেছেন ক্রমশই শিক্ষিত। ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি শুধু ঘরটাকেই দেখেন নি, দেখেছেন বাইরেটাকেও খোলা চোখে তাঁর সহজাত ক্ষমতা দিয়ে। ফলে তাঁর লেখায় আমরা দেখতে পেয়েছি এমন সব চরিত্র, যেগুলির মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই, বরং আছে প্রাণের নানা বৈচিত্র।

বাইরের শিক্ষা নয়, আশাপূর্ণা দেবীর মূলধন তাঁর আশ্চর্য চিন্তাশীল ও বলিষ্ঠ লেখনী। তার সাহায্যেই তিনি একের পর এক লিখে গেছেন উপন্যাস এবং ছোটগল্প। লেখিকার ব্যক্তিগত জীবন ছিল সমাজের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। যার পরিচায়ক হিসাবে তাঁর লেখায় বার বার ফিরে এসেছে সামাজিক প্রেক্ষাপট। কোনও বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, তাঁর রচনায় সমাজ এসেছে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে। তাই নিম্নবিত্ত পরিবারের দারিদ্র্য ও অশান্তির নগ্ন প্রকাশের পাশাপাশি তাঁর রচনায় পাওয়া যায় উচ্চবিত্ত সমাজের আভিজাত্য ও ভদ্রতার আড়ালে ঢাকা মানুষের হৃদয়ের টানা পোড়েন।

এক আশ্চর্য লেখনী নিয়ে জন্মেছিলেন আশাপূর্ণা দেবী। ১৩ বছর বয়সে প্রথম কবিতার মাধ্যমে সাহিত্য জগতে তাঁর আত্মপ্রকাশ। তার পরে একে একে 'বলয়গ্রাস', 'শোক', 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুল কথা'-র মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠলেন বাঙালী ঘরের একান্ত আপনজন। 'কখনও দিন কখনও রাতের' মধ্য দিয়ে বাঙালী যেন খুঁজে পেল তাদের প্রাণের আশাপূর্ণা দেবীকে।

নারী মুক্তি বা নারী স্বাধীনতার জন্য তিনি যেমন ভেবেছেন, তেমনই তার সমালোচনাও করেছেন তাঁর নানা গল্প উপন্যাসে। তাঁর লেখায় সর্বত্র মানুষের ও সমাজের মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনার এক অক্লান্ত প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর নিজের রচনার বিষয় বলার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, "আমি পুরুষ হলেও মেয়েদের জন্য লিখতাম।" লেখিকার এই উক্তি যে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ তা বোঝা যায় তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাসগুলি পড়লে। তিনি সাবলীল ভাবে বিচরণ করেছেন নারী হৃদয়ের প্রত্যেক প্রান্তভূমিতে। বলা যেতে পারে, তাঁর প্রায় প্রত্যেক লেখার মূল

উপজীব্য নারী— তার সুকোমল অনুভূতি, তার ক্ষোভ, বেদনা, দুঃখ ও লাঞ্ছনা। উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যেতে "প্রথম প্রতিশ্রুতি", "সুবর্ণলতা" ও "বকুলকথা" উপন্যাস ত্রয়ী, যেখানে বর্ণিত হয়েছে তিন প্রজন্মের তিন নারীর সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন।

আশাপূর্ণা দেবীর রচনা বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়, এমন কি, ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করে বিদেশী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। তাঁর পাওয়া অজস্র পুরস্কারের মধ্যে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার উল্লেখযোগ্য। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের প্রায় সায়াহ্ন বেলা পর্যন্ত অটুট লেখনীর সাহায্যে তিনি যে এক অমূল্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা বাঙালীর মনের মণিকোঠায় সঞ্চয় হয়ে থাকবে।

দেখতে দেখতে দশটা বছর অতিক্রান্ত। তাঁর আপোসহীন লেখনী স্তব্ধ হয়ে গেছে দশ বছর আগেই। বাংলা সাহিত্য আরও দরিদ্র হয়েছে। কিন্তু যে সামাজিক অন্যায়গুলির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন, তাকি মুছে গেছে? স্মরণ সভা ও আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মাঝে যেন আমাদের প্রাণের মানুষটি হারিয়ে না যান। তাঁর স্বপ্নকল্পিত সমাজকে বাস্তবায়িত করতে পারাটাই তাঁর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান হতে পারে। অরহেলায় যেন বাংলা সাহিত্যের এই স্নেহ, মায়া মমতা ভরা আশ্রয়টি হারিয়ে না যায়— তা আমাদেরই নিশ্চিত করতে হবে।

সত্যিই কি মানুষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পেরেছে?

তাপস বিশ্বাস *স্ট্যাটিসটিক্স্ সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ*

সময়ের সাথে চলতে চলতে বর্তমানে আমরা একবিংশ শতাব্দীর জগতে এসে বাস করছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এমন উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয় হল এই যে আমরা সবাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুহাতে বিজ্ঞানের দেওয়া অসংখ্য দানকে গ্রহণ করেছি তবুও আমরা অনেকেই এখনো পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারি নি। আমাদের অবস্থা একপ্রকার এইরকম যে আমরা দাঁত দিয়ে কেবল চিবিয়ে খেতেই শিখেছি কিন্তু দাঁতের মর্ম বুঝি নি।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষের বহু ছাত্রছাত্রীই আজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে পড়াশুনো বা গবেষণা করলেও মনে প্রাণে অনেকেই কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কে গ্রহণ করতে সক্ষম হয় নি। পড়াশুনায় সুপুত্তুর হয়ে অনেকে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলেও বিজ্ঞানের আসল চিন্তাধারা তাদের মধ্যে প্রকাশ পায় নি। প্রকৃত সমস্যা এখানেই তাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত বহু শিক্ষিত মানুষই এখনোও ভাগ্য বিচার করতে ভণ্ড, ঠগ, সাধুবাবাদের বা জ্যোতিষিদের কাছে গিয়ে থাকেন এবং বহু অর্থ খরচ করে তাদের দেওয়া মাদুলি বা কবজ ধারণ করেন। এখনোও তারা ভয় পেলে ভুতে, বিপদে পড়লে ভগবানে এবং এইসব সাধুবাবাদের অলৌকিক ক্ষমতাকে বিশ্বাস করেন।

আসলে কুসংস্কার বিষয়টা আমাদের এই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এত প্রবল যে কুসংস্কার দূরীকরণের পন্থা গুলি এখানে অসহায় হয়ে পড়েছে। এখনো আমাদের দিদিমা, দাদু কিংবা বাবা-মায়ের মুখে ভুতের গল্প শুনতে পাওয়া যায়। এখনো গ্রাম গঞ্জে মেয়েদের ডাইনি সন্দেহে হত্যা করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে এইসব ঠগ সাধুদের কথা শুনে অশিক্ষিত সাধারণ মানুষরা পুত্রসন্তান লাভের আশায় কন্যা সন্তানদের ভগবানের নামে বলী দিচ্ছে। আর দিন দিন সাধুবাবারা তাদেরকে অলৌকিক শক্তি অধিকারী বলে দাবী করছে।

সমাজের সাধারণ অশিক্ষিত মানুষরা জানে না বিজ্ঞানের আসল অর্থ। তাই তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে সাধুদের ক্রিয়াকলাপকে এবং ভূতে বা অশরীরি আত্মাকে। আসলে দোষটা এই সব সাধারণ মানুষের নয়, দোষটা হল শিক্ষিত জনসাধারণের কারণ তারাই যদি এই সব মিথ্যা অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করে তবে অশিক্ষিতের আর দোষ কোথায়?

শিক্ষিতরা কেবল বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতেই শিখেছে কিন্তু বুঝে উঠতে পারেনি তার আসল দৃষ্টিভঙ্গিকে। তা না হলে শিক্ষিতরাই হয়তো সাধারণ অন্ধকারে ডুবে থাকা মানুষদের কাছে বলতো যে পৃথিবীতে অলৌকিক বলে কিছু নেই সবই লৌকিক, সবই মনুষ্যসৃষ্ট। আর এটাই জগতের সবচেয়ে বড় সত্য। বিজ্ঞান মানেই কারণ এবং ফলাফলের মধ্যেকার সম্পর্কটিকে বুঝতে শেখা, আর এই জানা বা বোঝার দৃষ্টিভঙ্গিই হল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই তৃতীয় বিশ্বের দেশে থেকেও কিছু কিছু প্রকৃত মানুষ সত্যিই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে গ্রহণ করতে পেরেছে। আর তখনই তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনতে।

আবার কিছু মানুষ আছেন যারা পুরোপুরি না হলেও কিছুটা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু দেশের অগণিত অসংখ্য মানুষ আজও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অনেক বাইরে পড়ে আছেন, তারা ডুবে আছেন গভীর অন্ধকারে।

তাই বারে বারে শুধু একটি প্রশ্নই মনে জাগে সত্যিই কি মানুষ ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারবে? না তখনো কুসংস্কারের অন্ধকার তাদের গ্রাস করে রাখবে।।

We all want a superstition free World.

কেদারনাথ-বদ্রীনাথের পথে

জয়দীপ ঘোষ *বটানি সাম্মানিক, ২য় বর্ষ*

বাঙালীদের একটা অপবাদ চিরকালই শুনতে হয় যে বাঙালী মাত্রই অলস, কাজ করার প্রবণতা কম, উদ্যমের অভাব এবং বাঙালীদের কাছে একটা শব্দ নাকি খুবই বিখ্যাত, আর সেটি হল 'না'। এই 'না' শব্দটিকে 'হ্যাঁ'-তে রূপান্তরিত করা নাকি খুবই কষ্টসাধ্য। কিন্তু এই অলস বাঙালী যদি একবার ভ্রমণের স্বাদ পায় তাহলে তার উদ্যমকে হার মানাবার সাহস বোধহয় বিশ্বের কোনো জাতির নেই। ভ্রমণের প্রতি সেই চিরন্তন আকর্ষণের জন্যই গত বছর আমাদের গন্তব্য ছিল দুর্গম কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ।

আগের দিন, রাত থেকেই মনে উন্মাদনা ছিল। কারণ বহুদিন পর একটা বেড়ানোর সুযোগ পেলাম। এবারে আমরা মোট চারজন— বাবা, মা, বড়মাসি আর আমি। হাওড়া থেকে দুন এক্সপ্রেসে রওনা দিলাম। দুটো দিন ট্রেনে থাকতে হলেও বিরক্তি লাগেনি কারণ পরিবর্তনশীল প্রকৃতি তা দূর করতে সক্ষম হয়েছিল। সমতলভূমি ছেড়ে মালভূমি অবশেষে হরিদ্বারে কাছাকাছি সে সবুজ পাহাড়ে রূপ বদলালো। হরিদ্বার স্টেশন থেকেই দেখতে পেলাম চীরসবুজ মনসা পাহাড়, চণ্ডীপাহাড়, আরো দূরের পাহাড় গুলো হালকা নীলাভ এবং ক্রমশ অস্পষ্ট। ভারত সেবাশ্রম সংঘে উঠলাম। বেশ বেলা হয়ে গেছিল। স্নান সারতেই সংঘের ঘন্টার আওয়াজ কানে এল। জানতে পারলাম এটা Lunch এর সময়। ভিন রাজ্যে সমস্ত বাঙালীরা মিলে একসাথে বসে খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করলাম। বিকেলে হরি কি পাউরী ঘাটে এসেই চক্ষু চড়কগাছ। নদীতে জল নেই। জানতে পারলাম কোনো বিশেষ কাজের জন্যই বাঁধ দিয়ে জল আটাকানো হয়েছে। এই ঘাটে নাকি ভগবান বিষ্ণুর পদচিহ্ন আছে তাই এর এমন নামকরণ। প্রতি ১২ বছর অন্তর এখানে কুম্ভমেলা হয়। সন্ধ্যা আরতী দেখে সামান্য ক্ষীণ জলস্রোতে প্রদীপ ভাসিয়ে ফিরে এলাম। কালই কেদারনাথ, বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হব। বাবা একটি অ্যাম্বাস্যাডার— ঠিক করলেন।

ভোর ৫টায় ঘুম ভাঙল। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অ্যাম্বাস্যাডারে তুলে বেরিয়ে পড়লাম। পাহাড়ের পাকদণ্ডী দিয়ে যাওয়ার সময় খরস্রোতা গঙ্গার মূল স্রোত চোখে পড়ল। অপূর্ব সুন্দর পাহাড়ি ধুতুরা ফুল চোখকে জুড়িয়ে দিল। গাঢ় নীল আকাশ, সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত। সকাল ৯.৩০ নাগাদ Kaudiyala নামক একটি জায়গায় নেমে টিফিন সেরে নিলাম। দেখতে পেলাম খরস্রোতা গঙ্গায় কিছু দেশী, বিদেশী পর্যটক rafting করছে। সময়ের অভাবে আমার সে স্বাদ পূর্ণ হল না। তবে আপনারা যদি rafting এর রোমাঞ্চ অনুভব করতে চান তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন এই ওয়েবসাইটে—

www.gmvnl.com, E-mail পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায় gmvn@sancharnet.com.

আবার যাত্রা শুরু করলাম। এবার দেবপ্রয়াগে এসে থামলাম। নামটা চেনা। কারণ মাধ্যমিক ভূগোলেই আমরা পড়েছি এখানেই মন্দাকিনী ও অলকানন্দার মিলিত ধারার সঙ্গে গোমুখ থেকে আসা ভাগীরথীর মিলন ঘটেছে। ভাগীরথীর নীল জল আর অলকানন্দার ঘোলাজল মিলেমিশে একাকার। এরপর আমাদের গাড়ি মন্দাকিনী নদীর পাশ দিয়ে চলল, পথে কীর্তিনগর, শ্রীনগর (এটা কিন্তু কাশ্মীরের অন্তর্গত নয়) হয়ে রুদ্রপ্রয়াগে এলাম। এখানে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর

সঙ্গমস্থলে দেখলাম জগদম্বা মন্দির আর তার মাথায় রুদ্রনাথ। এরপর পথে অগস্ত্যমুনির আশ্রম, ফাটা, শোন প্রয়াগ পেরিয়ে গৌরীকুণ্ডতে এলাম। পথে চিরতুষারাবৃত কেদারশৃঙ্গ চোখে পড়ল। এখানেও ভারতসেবাশ্রম সংঘে উঠলাম। এখানে একটি উষ্ণপ্রস্রবন আছে। শুনলাম কেদারের মন্দির দর্শন করে এসে ক্লান্ত পর্যটকরা এই কুণ্ডের জলে স্নান করে ক্লান্তি দূর করেন। আজ রাতটা বিশ্রাম করলাম। কাল কেদারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হবে।

রাতে ঘুম ভালোই হল। সকাল ৬টা নাগাদ খুব অল্প মালপত্র নিয়ে আমরা চারজন রওনা দিলাম। তখনও চারদিক ঘন অন্ধকার। এই যাত্রাটা অনেকটা ট্রেকিং এর মত। তবে পায়ে হেঁটেই সেই রোমাঞ্চ অনুভব করা সম্ভব। কিন্তু যাদের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা নেই তারা— ডুলি, পালকি, খচ্চর প্রভৃতি বাহকের সাহায্য নিতে পারেন। তবে স্বল্প পরিশ্রমে যেতে গেলে ট্যাঁক থেকে ভালোরকম টাকাই খসাতে হবে। আমরা ৫টাকা দিয়ে বাঁশের লাঠি কিনলাম। চড়াই পাহাড়ের গা দিয়ে উঠতে লাগলাম। বাবা, মা সবাই পিছনে পড়ে যাচ্ছিল। যত আসতে হাটতে লাগলাম ততই পায়ে ব্যাথা হতে লাগল। এই সময় হাওড়া নিবাসী সঞ্জীবদার সঙ্গে পরিচয় হল। রাস্তা যেহেতু একটাই তাই সঙ্গী হিসাবে সঞ্জীবদাকেই বেছে নিলাম।

গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারের দূরত্ব ১৪ কিমি। ভেবেছিলাম খুব সহজ ব্যাপার। কিন্তু যতই উপরে উঠতে লাগলাম দম বেরিয়ে যাবার উপক্রম হল। রামওয়াড়া নামক একটি গ্রামে সামান্য টিফিন করলাম। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করতে করতে এগিয়ে চললাম। আমাদের পাশ দিয়ে ক্লান্ত 'খচ্চর' গুলো মোটা মোটা মানুষদের পিঠে নিয়ে কোনো রকমে এগিয়ে চলছিল। খুব মায়া হল। মানুষ একদিকে পুণ্য অর্জন করছে কিন্তু অপরদিকে এই অবলা জীবদের কষ্ট দিয়ে ততটাই পাপ করছে। এই সময় এক অল্পবয়সী আমেরিকানকে দেখলাম খালি পায়ে হ্যাফপ্যান্ট পড়ে উপরে উঠছে। আমাদের দেখে সে বলল— "জে কেডার", আমরাও তাকে উৎসাহ দেবার জন্য বললাম 'জয় কেদারনাথ'। সকাল ১১টা নাগাদ গরুরচটি নামক একটি গ্রাম পেরিয়ে কেদারে পৌছোলাম। মা বাবারা তখন কোথায় জানি না। তাদের পৌছোতে বিকেল হয়ে গেছিল। এই সময়ের মধ্যে সঞ্জীবদার কাছ থেকে টাকা ধার করে টিফিন করেছিলাম। বাবা এসে প্রচণ্ড বকলেন। একটি হোটেল ঠিক করে কেদারের মন্দির দর্শন করতে গেলাম।

কলকাতা থেকে ১৭৫১ কিমি দূরে ৩৫৮৪ মি উচুতে হিমালয়ের নয়নাভিরাম নৈসর্গিক শোভার মাঝে বিরাজ করেছেন কেদারনাথজী। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম এই কেদারনাথ। কেদারশৃঙ্গের তলদেশেই মন্দির। পুরোহিতদের মুখে শুনলাম দুধগঙ্গা, মধুগঙ্গা, স্বর্গদুয়ারী ও সরস্বতী, স্বর্গের এই চার নদী এসে মিশেছে মন্দাকিনীর সলিলে। সাধারণত দীপাবলীতে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়, খোলে অক্ষয়তৃতীয়ায়। বছরের বাকি সময়টা এই অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে। স্থানীয় মানুষরা সমতলে নেমে আসেন তাই কেদার দর্শনের মরশুম May-June ও Sep-Oct. মন্দিরের পিছনে, হিন্দুধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী ঘোষণা করে হিন্দু ধর্মকে সনাতন বৈদিক আদর্শে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যিনি সেই জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের সমাধি। এখানে ছবি তোলা নিষেধ। আর মন্দিরের সামনে ডাইনে সরস্বতী পেরুতেই হংসকুণ্ড, পাশেই ফলাহারী বাবার সমাধি। চারটি কুন্ড রয়েছে কেদারে রেতঃ, উদক, রুদ্র এবং ঋষি। কথিত আছে মন্দিরের সামনের উদকের জলপান করলে পুনর্জন্ম হয়না। কিন্তু আমি আবার এই সুখ দুঃখময় পৃথিবীতে জন্মাতে চাই তাই ওই জল পান করিনি। সারাটা রাত প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ঘুম হয়নি। হোটেলে সুব্যবস্থা থাকলেও তা এই ঠাণ্ডা রুখতে অকার্যকর। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। সকাল ৬টা নাগাদ হোটেল থেকে বেরিয়ে মন্দিরের পুজো ও আরতী দেখলাম। তখন শুধু কেদারশৃঙ্গের মাথাটা সূর্যালোক পেয়ে সাদা হয়েছে। সকাল ১১টা নাগাদ কেদার থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তবে কেদারের যাত্রীদের জন্য একটা পরামর্শ যে কেদারে Night stay করবেন না। দিনের দিন গৌরীকুণ্ডে ফিরে আসুন।

গৌরীকুণ্ডে ফিরে, কুণ্ডের গরমজলে স্নান করলাম। মনে হল এক নিমেষে সমস্ত ব্যাথা উধাও। গৌরীকুণ্ড থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, পিছনে পড়ে রইল কেদারশৃঙ্গ। এরপর পথে চোপতা হয়ে মণ্ডল নামক ছোট্ট শহরে Night stay করলাম। মণ্ডল থেকে কিছু দূরে অন্য একটি পাহাড়ে গোপেশ্বর নামক একটি শহরের অবস্থান। রাতে সেই শহরটি ঝলমল করছিল। মনে হচ্ছিল পাহাড়ের ওপর কারা যেন মণিমাণিক্য ছড়িয়ে রেখেছে।

রাতে ভালোই ঘুম হয়েছিল। ভোর ৪.৩০এ আবার যাত্রা শুরু করলাম। দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম অত ভোরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মণ্ডলের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা পড়তে যাচ্ছে। কলকাতায় ছেলেমেয়েরা সেটা ভাবতে পারছে কি! পথে পিপলকোঠী, যোশীমঠ, পাণ্ডুকেশ্বর, হনুমানচটী পেরোলাম। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম যতই বদ্রীনাথের দিকে এগোচ্ছি সবুজ পাহাড় ক্রমশ গাছপালাহীন, ধুসর পাহাড়ে রূপান্তরিত হচ্ছে। আকাশ আরও কালচে নীল বর্ণ ধারণ করছিল। যাবার পথে পাহাড়ের গায়ে লেখা বিভিন্ন সতর্ক বাণী চোখে পড়ল— "Be bright on the curves", "Alert today alive tomorrow", "Hurry makes worry", "I like you but not your speed." ইত্যাদি। এগুলি ড্রাইভারকে প্রতিমুহূর্তে সতর্ক করার জন্য যথেষ্ট। বদ্রী যাবার পথে একটি বিশেষ Gate system চোখে পড়ল। আমাদের গাড়ি 6 am থেকে 7am এই gate system এর মধ্যে বদ্রীনাথ পৌছোলো।

এখানেও গৌরীকুণ্ডের মত একটি উষ্ণপ্রস্রবন আছে ঠাণ্ডায় ভক্তদের যাতে কষ্ট না হয় তাই ভগবানের এই অদ্ভুদ সৃষ্টি। পুরোহিতদের মুখে জানতে পারলাম শঙ্করাচার্য বদ্রীনাথেও এসেছিলেন। কথিত আছে প্রাচীন দেবমূর্তি নারদ কুণ্ড থেকে উদ্ধার করে তপ্ত কুণ্ডের কাছে গরুড় গুম্ফার প্রতিষ্ঠা করেন আচার্য দেব। আরও পরে গাড়োয়ালের রাজারা বর্তমান মন্দিরটি গড়ে প্রতিষ্ঠা করেন দেবতা। ১৩শ শতকে মন্দিরের শিখরটি সোনায় মুড়ে দেন ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ। এইসব শুনতে শুনতে আমরা যেন সেই ইতিহাস চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। মন্দিরের পূজো, আরতী দেখলাম।

বদ্রীনাথের অদূরেই ভারতের শেষ গ্রাম মানাগ্রাম। এই গ্রামটি মূলত তিব্বতীদের। চীনের সীমানার কাছে বলে এখানে রয়েছে ভারতী সেনার ক্যাম্প। এখানে ব্যাসগুহা পরিদর্শন করলাম। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সরস্বতী নদী। কথিত আছে মুনি ব্যাসদেব দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ পেয়ে এখানে বসে মহাভারত রচনা করেন। তিব্বতীদের কাছ থেকে কিছু উপকরণ কেনাকাটি করে ফিরে এলাম। এবারে হরিদ্বার ফিরে যাবার পালা। মন খুব খারাপ হয়ে গেছিল। গাড়ি এগিয়ে চলল আর আমি দূরে পাহাড়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। এতদিনে কবিগুরুর এই কথাগুলো উপলব্ধি করতে পারলাম—

"পর্বতমালা আকাশের পানে
চাহিয়া না কহে কথা—
অগমের লাগি ওরা ধরণীর
স্তম্ভিত ব্যাকুলতা।।"

বহু বিনিদ্র রাত্রির একাকীত্বের সঙ্গী ঃ স্মৃতির মণিকোঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা কিছু মুহূর্ত

সুস্নাত চ্যাটার্জী *গণিত (সাম্মানিক) বিভাগ, প্রথম বর্ষ*

অভিজ্ঞতার অভিধান হল মানবজীবন। সেখানে বৈচিত্রময় জীবনরসের উপস্থিতি। সেই অভিধানে যেমন কখনো স্থান নেয় ইন্দ্রনাথের মতো দুঃসাহসিক বন্ধুর দুর্বার অভিযানের অভিজ্ঞতা, কখনো বা শ্রীকান্তের আত্মজীবন বিশ্লেষকের উপস্থিতি। কখনো বা অন্নদাদিদির মতো স্নেহময়ীর সাহচর্য, কোথাওবা চিহ্ন রেখে যায় কমললতার মতো আত্মোৎসর্গী প্রেমিকা, কোথাওবা রাজলক্ষীর মতো নারীর ঘনিষ্ঠতা, কখন বা অভিজ্ঞতার অনেকটা অংশ নিয়ে নেয় মেজদা, নতুনদার মতো ব্যক্তিত্বে রস। কিন্তু স্মৃতিরোমন্থন করতে গেলে কী ব্যক্তিসর্বস্ব স্মৃতিই ভরিয়ে দেয় মনকে? আমার মনে হয় না। কখনও কখনও প্রকৃতির নিয়মেই প্রকৃতির লীলা আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় স্থান করে নেয়। কখন বা কোনো নিঃসঙ্গ একাকীত্বে উপলব্ধ বিষাদময় প্রকৃতির রূপ, কখন বা আনন্দের কলরোল। এইরকমই এক ঝড়ের রাত্রিতে পরিচিত হয়েছিলাম প্রকৃতির উচ্ছ্বাসের সঙ্গে। কবিগুরুর কথায় প্রকৃতির ক্ষেত্রেও তা "যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম"। আজও আমার স্মৃতির মণিকোঠায় অমলিন, দোতলায় একাকী কাটানো এক ঝড়ের রাত্রি।

সন্ধের আগে থেকেই "আকুল আশ্বিনে"র আকাশে ভিড় করতে থাকে মেঘের দল। শুভ্র মেঘপুঞ্জকে ঢেকে দিয়ে, নিরঙ্কুশ অধিকারে দখল করে নেয় আকাশ। সূয্যিমামাকে রক্তিম আলোকে পৃথিবীকে রাঙিয়ে বিদায় দেবার সুযোগ না দিয়ে কালো মেঘের সারি তাকে নির্ধারিত সময়ের আগেই নির্বাসিত করে। বাড়ি ফিরে তখন আকাশের দিকে চেয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়ার যে অনুভূতি, তা ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে ভাষার কার্পণ্য বড় নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়বে, তাই অভিজ্ঞতার অভিধান হাতড়ানো এই লেখকের হৃদয় এখন বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশমুখী।

যখন ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম, দেখি আকাশ জুড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে পাখির দল। না, না, না, ওরা উড়ছে না! ওরা আসলে ঘরে ফিরছে। হয়তো ভেবেছিলো দিনের আলোয় আরো কিছুটা খাবার সঞ্চয় করে নেওয়া যাবে বাসায় থাকা চোখ না ফোটা সদ্যপ্রসূত বাচ্ছাগুলোর জন্য। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন এই মৃদু আলোকে এখন খাবারের সন্ধান ছেড়ে তারাই ধাবিত বড়দীঘির পাড়ে বটগাছটার গায়ে বাসার দিকে। আসন্ন বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে হবে যে চোখ না ফোটা বাচ্ছাগুলোকে। হঠাৎ দমকা ঝোড়ো হাওয়া, ক্ষণেকের কবিমনকে কাব্যিক জগৎ থেকে এক হ্যাঁচকা টানে কর্তব্যপরায়নতার জগতে টেনে এনে ফেলে, "বাইরের ঘরের কাঁচের জানলাগুলো বন্ধ করতে হবে, সে খেয়াল আছে? ভেঙে গেলে কী হবে?" কিন্তু তবুও কর্তব্যের টানে বড়ছাদ ছেড়ে শরীর ঘরের পানে ধাবিত হলেও মন মেঘাচ্ছন্ন স্বপ্নালোকে ঢাকা আকাশের দিকবিদিকে ধাবমান পাখিদের জন্য রেখে যায় এক প্রশ্ন—

"আজি এই আকুল আশ্বিনে
মেঘে ঢাকা দুরন্ত দুর্দিনে,
হেমন্ত ধানের ক্ষেতে বাতাস উঠেছে মেতে
কেমনে চলিবে পথ চিনে?"

সারা সন্ধে কাটল ঝিরঝিরে বৃষ্টি, কখনো বা দু এক পশলা ঝেঁপে। চারিদিকে ব্যাঙের শব্দ ছিল প্রাকৃতিক

পরিবেশের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত। সঙ্গে ছিল আধুনিক রেকর্ড প্লেয়ারে কবিগুরুর গানের ডালি, "ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার।" এক অনাবিল পূর্ণতা ছিল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে। এরমাঝেই দেখলাম দেওয়াল ঘড়িটা দাঁত মুখ বিকৃত করে, হাত পা ছুঁড়ে' হাতুড়ি মারার মতো শব্দে জানিয়ে ছিল রাত্রি দশটা। খেতে নিচে নামতে যাচ্ছি। সিঁড়িও বর্ষার জলে স্নাত। সবকিছুর মধ্যে তবু অনুভূত হচ্ছিল একটা অপূর্ণতা। কিন্তু কোথায় সেই অপূর্ণতা, তা হৃদয় অনুসন্ধান করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। এমনকি খাওয়া শেষ করে নিজেকে ছাড়া আর বর্ষাতিতে আপাদমস্তক মুড়ে প্রকৃতিকে আরো কাছ থেকে দেখে আসার পরেও। মনটা ঠিক তৃপ্তি পাচ্ছিল না। অতঃপর এগারোটায় উপরে শুতে গেলাম। আকাশে মেঘ আরো জমিয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছে। জলের ধারার জোরও বেড়েছে। মাঝে মাঝে আছে বিদ্যুতের ঝলকানি। সন্ধ্যা কাটিয়েছি

"শান্ত ঝড়ে, ঝিল্লিরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে,
মুক্ত বাতায়নে।"

কিন্তু হৃদয় এখন মুক্ত বাতায়ন চাইলেও প্রকৃতি বিদ্রোহ করল। "আশ্বিনের অসীম আধার" যে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করেছে, তার বিদ্রোহের সামনে তাই শেষ অবধি মাথা নত করলাম। কারণ—

"নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামহীন।"

ঘর ছেড়ে গিয়ে বসলাম ঘেরা বারান্দায়। দুর্যোগের তীব্রতাও প্রকৃতির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারল না। এরপর হঠাৎই লোডসেডিং। চারদিক অন্ধকার। তাড়াতাড়ি হাতের কাছে টর্চটা জ্বাললাম। বর্ষার ক্রমবর্ধমান গর্জনের স্বরের সঙ্গে সঙ্গত রেখেই এ হৃদয় যেন আমাকে আলো জ্বালাতে বারণ করল। উপলব্দি করলাম আলোই এ রাতে পরিপূর্ণতার পথে একমাত্র বাধা। এই তীব্র বর্ষাপ্লাবিত অমাবস্যা যদি হয় পৌরুষ, চারিদিকের গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতাই তার প্রেয়সী, সেখানে জ্বলতে থাকা কোনো আলোই ভুলবোঝাবুঝির সূক্ষ্ম ব্যবধান। তাই আজ যে সব আলো নিভোতেই হবে—

"আজ যদি দ্বীপ জ্বালে দ্বারে
নিবে কি যাবে না বারে বারে?
আজ যদি বাঁশি বাজে গান কি যাবেনা ভাসি
আশ্বিনের অসীম আঁধারে?"

আশ্বিনের এই আঁধারে এরপর ক্রমবর্দ্ধমান ঝড়ের তেজ। ক্ষীণকায় সুপারি গাছগুলো শুরু করে অস্তিত্বরক্ষার লড়াই— "survival of the fittest." চোখের সামনেই হার মানে জীবজগৎ। মাথা নোয়াতে বাধ্য হয় প্রকৃতির কাছে। বারান্দার চেয়ারে বসে, ধূসর মেঘে ঢাকা আকাশের প্রেক্ষাপটে দেখি শোঁ শোঁ শব্দে ছুটে আসা ঝড়ের সামনে ভেঙে পড়ে দুটি সুপারি গাছ, বিদ্যুতের তার ছিন্ন করে। শুরু হয় ঝড় ও জলের মিলিত তাণ্ডব নৃত্য। রচিত হতে থাকে এক অদ্ভুত সঙ্গীত, নিয়ত সেখানে চলতে থাকে সৃষ্টি, মৃত্যু ও অস্তিত্বরক্ষার লড়াই। ভেঙে পড়া দুই সুপারি গাছের সমব্যথী এক বিরাট আমগাছ নিজের ডালপালায় ঝড়ের তেজ আটকে প্রাণরক্ষা করে দুটি ছোট ছোট পেয়ারা ও লেবু গাছের। এ যেন— সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের এক আত্মাভিমানী প্রতিবাদ। আমি যখন নিরাপদ আশ্রয়ে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য দেখতে, তার সুষমা উপলব্ধিতে ব্যস্ত, তখন উদ্ভিদকুল লড়ছে জীবনের লড়াই, জীবনরক্ষার লড়াই। হঠাৎই বাড়ির সামনে একটা চালাঘরের চাল উড়ে যায়, অসহায় পরিবার যা হোক করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ব্যস্ত। উড়ে আসে এক পরিত্যক্ত পাখির বাসা। বাড়তে থাকে শ্রাবণধারার জোরও। ভেকের ডাক, মাটির রাস্তা দিয়ে বয়ে আসা ঝিরঝিরে জলের ধারা, ঝড়ের শোঁ শোঁ শব্দ, ধূসর আকাশের প্রেক্ষাপটে বার বার আন্দোলিত হতে থাকে ভীষণাকৃতি হাতির মস্তিষ্কের মতো কালো গাছগুলি যা আমাকে সারারাত বসিয়ে রাখে। পুকুর রাস্তা সব ততক্ষণে এক হয়ে গেছে—

"পূবে হাওয়া বয় কূলে নেই কেউ,
দুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,"

খেয়ালই করিনি কখন সময় কেটে গেছে দ্রুত। যখন ঘড়ি দেখলাম, রাত সাড়ে তিনটে। এতটাই মুগ্ধ ছিলাম রূপসী বাঙলার আধারা রূপের অন্তরালে, যে ঘড়ির আওয়াজও মনকে বাস্তবজগতে টেনে নামাতে পারেনি।

সত্যিই সে এক অপূর্ব রাত্রি। তমসাচ্ছন্ন গহন আমাবস্যার নিটোল পূর্ণতা, প্রকৃতির আবছা রূপ। মাঝে মাঝে অল্প উদ্ভাসিত বিদ্যুতের আলোয়, যেন সত্যিই নিভন্ত পিদ্দিমের আলোয় ঘোমটা ঢাকা অর্দ্ধোৎভাসিত কোনো কমললতার অশ্রুস্নাত চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি। সে যেন সুচেতনা। তবে তার সৌন্দর্য কোনো দূরতর দ্বীপ নয়। তা হৃদয়ের কাছাকাছি। প্রকৃতি যেন সেখানে সত্যিই শাশ্বত বর্ষার ঝর্ণাধারায় সুস্নাত। প্রকৃতি কখনো মিনির মত শিশুচপল, কখনো ইন্দ্রনাথের মতো যৌবনের তেজে দুরন্ত, কখনো বা রাজলক্ষ্মীর মতো রঙীন, আবার কখনো বা শ্রীকান্তের মতো নিখাদ রোম্যান্টিক। ধ্বংসের মাঝেও সে "খেলাঘর বাঁধে"। পারিপার্শ্বিকই সেখানে মনের ভেতর। সত্যিই সে রাত্রি যেমন অভূতপূর্ব তেমনি অশ্রুতপূর্বও। তার সেই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য আজও আমার স্মৃতির মণিকোঠায় ধরা আছে।

সকালে হঠাৎ যখন ঘুম ভেঙে গেল, ঘড়িটার ঢং ঢং আওয়াজে, তখন ঘরময় রোদ্দুর। বাইরে গিয়ে দেখলাম চারিদিক খট্‌খটে শুখনো। বাড়ির সামনের মাটির রাস্তাটা থেকে সামান্য সান্ত্বনা খুঁজতে গিয়েও হতাশ হলাম। যেটায় সামান্য বৃষ্টিতেও জল জমে থাকে, সেটাও শুখনো। বুঝলাম কাল রাত্রের সকল পাখির উড়ে যাওয়া, প্রবল বর্ষণ, তীব্র ঝড়, কমললতার দৃষ্টি সবই দৃশ্যমান হয়েছিল মর্মচক্ষে, চর্মচক্ষে নয়। প্রবল বর্ষণেও সিক্ত হয়েছিল মনের প্রকৃতি। তাই আজও মনটা বেশ ভিজে ভিজে। বারবার মনে হচ্ছিল এরকম একটা রাত্রির আস্বাদ বাস্তবেই বা কীরকম, বাড়ির মেনসুইচ অফ্ করে, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতি তো লোডসেডিংকেও ভুলিয়েছে।

এক জীবাস্ম জীবন

দেবদ্যুতি গুড়্যা *ভূতত্ত্ববিদ্যা সাম্মানিক, ৩য় বর্ষ*

ওল্টানো কফিনের মত একটা প্লাটফর্ম
বেঞ্চের উপর, মেঝেতে হলুদ রেণুর মত
অসংখ্য রাধাচূড়া পড়ে।
দূরে লাল সিগন্যাল তখনও নীল হয়নি।
খালি গায়ে লুঙ্গি পরা, একমুখ দাড়ি নিয়ে
একটা লোক, বিড়ি খেতে খেতে,
পাশের বেঞ্চটায় বসে।
আর গুনগুন করতে করতে ভাটিয়ালির সুরে
শ্যামাসঙ্গীত গায়।
আমি উন্নাসিক ভেবে চলি,
সত্যি, পৃথিবীটা পাগলে ভরে গেছে।
"কটা বাজে?"
যান্ত্রিক উত্তর! পৌনে পাঁচ।
আজকাল পাগলরাও সময় মাপে।
দূরে কোথাও ভোঁ বাজে।
"কি করা হয়? কলেজে পড় নিশ্চই?"
এড়াবার উপায় নেই,
কষ্ট করে গলা দিয়ে বেরোয়' 'হুম্'।
চক্‌চকে রেলপাত, শান দেওয়া কাস্তের মত
গলায় বসতে চায়।
লোকটা বিড়বিড় করে
একটা ইংরেজী কোটেশন বলে।
আমার বোকা মুখের দিকে তাকিয়ে
বলে, আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি আর মার্কসীয়
রিলেটিভিটির তফাৎ জানো?
আমি হাঁ হয়ে বলি, 'না মানে, আপনি?...
"-'71, গ্র্যাজুয়েট মৌলানা আজাদ কলেজ"—
রেললাইনের ধারে শিরীষ গাছ
তার মাথায় ভাঙা চাঁদ লটকে,
আকাশ উপচে পড়া ঘোলা আলো
তার চোখে।
৩০ বছর আগের এক জীবাস্ম রাত্রি
বোধহয় নড়ে ওঠে তার চোখের পাতায়।
ওরা চারজন,
দূরে হাইওয়ের আলো,
আর এপারে জোনাকির আলো শুষে নেওয়া অন্ধকার
ওদের রক্তে বিজবিজ করছিল
দুনিয়া বদলানোর উত্তাপ
এবং তা রক্ত আর বুলেটের বদান্যতায়।
একজন কেউ বলে উঠল—
'শালা, পুলিশ টের পায়নি তো'?
অন্য জনের গলা, তাহলে এটাই তাদের শেষ রাত।
তারপর পাত খসানো অন্ধকার থেকে বিশ্বাসঘাতকের মত
কিছু একটা নড়ে উঠল।
আর অন্ধকারটাকে ছবির মত কাটতে কাটতে
চলে গেল অজস্র বুলেট।
কখনও সামনে কখনও পেছনে।

"মানুষ মেরেছি কত।"
লোকটা তার ময়লা, রোগা হাতটা বাড়ায়।
খানিকটা লুঙ্গি তুলে পা টা দেখায়।
পরপর দুটো বুলেটের গর্ত।
থ্যাঁতলানো কালো হয়ে যাওয়া পেশীর মধ্যে
সেই দুনিয়া বদলানোর উত্তাপটা
আর টের পাওয়া যায় না।
লোকটা একটু হেসে বলে
'আমার কোন অনুশোচনা নেই।'
নকশালদের কোন অনুশোচনা হয় না।
এতক্ষণে সিগন্যালের রং বদলায়।
স্টেশনে ট্রেন থামে।
অনেকগুলো জটলা, একটা পকেটমারকে
বোধহয় গণধোলাই দেয়।
আবার ট্রেন আসে, চলেও যায়।
তারপর সব চুপচাপ
লোকটা এক অনাবিল সুখী মুখে
একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে।
তারপর কাশতে কাশতে বলে
'আজ বড্ড ওমোট'।
"হবে না,— বড় পাপ,
'পৃথিবীটা পাপে ভরে গেছে।'

Conversation

Tapobrata *Philosophy (hons.) 2nd year*

.....then he tried
to do all the things
he can't. he failed
he does again.
he asked me, are you happy, anyway?
I felt black, I say stay away.
he chose me
all he chose
but where love belongs,
behind this blue?
I said, stay away, is it from me?
then I awoke, to be away from dreamy.
and then he got to bed
all conversation ends
but a mystry remains.
I can't remember he went.

Why

Anisha Ayaz *Philosophy (hons.) 2nd year*

Why not we have peace for once?
Why not lay aside our guns?
Why do we hate instead of Love?
Why do we always push of shove?
Why not we End all wars totally?
Why do we End this world totally?
Why don't we simply love and live?
Why instead of taking, why not give?
Why can't we live like human?
Why not we try peace for once?

Time

Jaya Mondal *B.A. (General), 3rd year*

The time in work
It is the prize of success,
Take time to think
It is the source of power,
Take time to pray,
It is the key to revolution,
Take time to play,
It is the source of wisdom,
Take time to be good
It is the road of happiness,
Take time to dream
It is the way to the moon,
Take time to love
It is the privilege of the good.
Take time to laugh
It is the music of the soul.

Still Higher

Ananda Mitra *English (hons.) 2nd year*

Pretty bird,
It's nice to know
Thet you've found another place
to perch you pretty body,
and test all you can taste,
before you fly away still higher
setting another nest on fire
i've liked you
wish i could be like you
Pretty bird,
It's nice to know
That you still smile,
When you see me now-a-days.
i guess it's been awhile
before you fly away still higher
setting another nest on fire
i've liked you
wish i could be like you

Fashion— New Horizons

Sneha Priya Bhanja *Pol. Sc. (hons.) 2nd year*

Fashion photography is more finely tuned to shifting styles and interests than any barometer of style, and a means of giving substance to the often subtle changes in the fashion industry. Ostensibly, fashion photography is about highlighting new trends in the world of fashion? but is actually often more concerned with and although it would not exist without the commercial foundation of fashion magazines, couturiers and the clothing industry in general, there is more to it than that. An insubstantial subject would certainly not have attracted the talents of such photographers as David Baily, Hans Feurer, Norman Parkinson to name only a few. One of the fascinations of Fashion Photography is that, being so completely concerned with the elusive subject of style it virtually demands a sensitive intuitive approach. It does not lend itself readily to cut– and– dried analysis.

The sense of style which is at the heart of good fashion photography applies both to the content of the shot and to its timing. The content in cludes choice of model his/her clothes, accessories, make us setting, and the overall mood. These items can rarely be planned in advance, and the selection of clothes normally precedes everything else. Often a collection of clothes is photographed in one session, and the most usual practice isto link them together in to some part of a theme. This theme may suggest itself by the very nature of the clothes-autumn colours, for instance, or evening dresses or it may be artifically developed. Some of he most distinctive fashion photographers impose strong styles on the cloths they work with.

The role of model varies in importance. In catalogue photography for instance, models are often used to merely display the fashions. In a major magazine feature, however the model may dominate the shots, and some models have developed powerful reputations, jealously guarded by the magazine or photographers who nurtured them.

Glamour photography is, on the whole, more practical in its approach as it is closely related to the cosmetics industry. It is chiefly concerned with the task of enhancing appearances. Nevertheless, a fine appreciation of style is necessary as beauty is itself an evererchanging quality. Here, the choice of model is of paramount importance-more than anything else? One is modelling oneself. New trends hair style, skin colour, and other physical attridutee may came, but some things remain fairly constant. A pronounced facial bone structure, particularly high cheekbones, is nearly always good for photography. Age too is important in most cases, as skin texture and muscle tone are generally at their best in youth. And even the slightest tendency to plumpness has not been fashionable for decades.

Try to Fly

Sneha Priya Bhanja *Pol. Sc. (hons.) 2nd year*

Thousands of years ago, even before the days of history, men used to look up at the birds in the sky. But men were creatures of the earth. They could travel the rivers and lakes and seas and a little way out on the ocean. But they could never travel the great ocean of air above the earth. In the eleventh century, some men did actually try to fly. They strapped wing like devices to their arms and legs, and jumped off high towers and cliffs. Most of them were killed or badly crippled.

Time went on, and many things changed. But men did not lose their longing to fly. And one of the men who took up the challenge, was leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci studied the birds carefully and watched them how they moved. He studied the air, too. Leonardo designed an orthopter a flying machine with flagging wings to be worked by a man's arma and legs. With all of his study, Leonardo could not meet the challenge from the sky. His flying machine did not fly.

In the year 1782 in the town of Annonay in France lived two brothers named Joseph and Etienne Montgolfier. They were planning to use any substance lighter than air. The days passed but they could find no solution. One fine day they found a small silk bag and held it over the flames when they noticed that, the bag slightly rose by the air. The brothers tried the experiment again and again, and then decided to make an experiment outdoors with a large bag. They held a liner bag thirty-eight feet in diameter over a fire of straw. The bag rose 6,000 feet, travelled for ten minutes, and fell to earth a mile and half away. The Montgolifers had discovered the balloon.

When the Montgolifeir brothers sent up the first balloon in 1783, words quickly spread to England. Everybody who heard the news was excited, and one of them was George Cayley. After ten years on ordinary kite gave Cayley the idea for the first model of a glider. He used a kite as an aircraft wing by attaching it to a pole. Cayley foresaw that airplanes of the future world be driven by a propeller instead of by flapping wings. He has been called the father of aeronautics. His last design was for a steam powered convert plane, a combination of helicopter and airplane.

The first inventor to use Cayley's ideas was William Henson, an Englishman in the lace-making business. In 1842 aided by John string fellow, he designed the Aerial steam Carriage. Henson & Stringfellow built a model with a wings pan of twenty feet. But it did not fly because the engine was too heavy and did not produce enough power.

The History of Aviation began on December 17th, 1903 near kitty Hawk. on that day two brothers Orville and Wilbur Wright who operated a bicycle manufacturing shop in Dayton. They made the worlds' first successful air plane flights.

They had built their aeroplane after studying the writing of other aviation pioneers and experimenting with gliders & kites and wind tunnels. They had themselves built an aircraft named "flyer", which was a biplane with a four cylinder, gasoline, engine. This was the beginning of the aircraft experiment in the history of Aviation.

The World Today

Md. Ishraq-ullah *English (hons.) 2nd year*

The world is going ahead at a very fast pace, and the human mind is detoriating at the same speed. What was considered 'sin' a few years ago is called 'modernity' in today's world.

As quoted in the Quran, Allah has created human beings to be the best of his creations. He has given human being the power to think and judge. But let us ask our selves how true it is. Are we really the best of his creations? Then why is it that we are becoming more animal— like in our existence? Why is it that we have lust for each others blood just like wolves? Why is it that we abandon our old and disabled parents to the old age homes? Are they such a burden to us? Then let me tell you a story.

One day a man come to prophet Muhammad (peace be upon him) and said, "My lord, I live in Medina and I had taken my disabled mother to Mecca for Haj. I had to suffer a lot of hardships and observe utmost patience. Is the deft towards my mother forfitted?" Now in those days there was no other means of transport except camels, and the distance between Mecca and Medina is roughly around 150 miles and the day temperature rises above 100°F. One can really imagine the plight of the young man. But people will be surprised by the answer of the Prophet (peace be upon him). Prophet Muhammad (peace be upon hiss) replied, "My man which debt are you talking about? you have not forfitted the debt of even one drop of her milk that you have drunk!" So that is the debt that our parents have on us. Now that we have grown up we tend to forget those mights of our infancy when we were sick. Those were the mights when our parents kept awake the whole night trying to make us comfortable so that we could sleép. How, we have to ask ourselves, how can me abandon such parents, the ones who went hungry to feed us? The ones who kept awake to let us sleep?

How can people forget the teachings of their religions? there is no religion in this world which does not call us towards God, does not teach us to do good and refrain from evil. Do we follow those teachings?

If anyone has a pet dog at home then that person will understand. They must have seen that when they call out to their pet dog, it comes running to them no matter what it had been doing. Even if it had been eating, it would leave its food and come to its master. Now judge for yourselves, The 'Muazzins' of the mosques call people towards Allah 5 times a day and all other religions also call us towards God. How much do we answer the call? Is a dog, then better then us?

My dear friends this world is just a mirage the more we try to get closer, the further it goes away from us. This world is not the reality. My dear friends, please try to understand it. We have to leave this world any moment. Our life is as long as the next breath that we take. It is then that we have to stand in front of the almighty. What face will we have in front of Him? What face will we tell Him? Will we tell Him that I have not listened to your commands and the techings of your prophets? I have thrown my old parents out of the house? I had been unfaithful towards my wife? I had assumed unfair means to gain my ends?

Now judge for yourselves my dear friends, will He be happy to hear all this? Will He send us to Paradise?

The world has turned into a great crowd of ignorance. Why do we have to be another face in the crowd? Why can't we be an individual in the light of knowledge. For this we have to find the truth. Our conscience will always guide us if we are tempted. Remember temptation is not a sin until we indulge in it!!!

The Life and Times of a Rockstar

Ranadev Purakayastha *English (hons.) 1st year*

'The Day The Music Died!'— A renowned magazine cover headline screamed when John Lennon was shot dead by Mark Chapman. A tragic, unwarranted and definitely most unexpected end to a man who actually meant what the magazine cover proclaimed. He, for many, meant music. He was the music. And to think that the end came after a decade-long musical crusade for world peace and brotherly lovemade it more shockingly cruel.

Oh! Is there anything possibly left to be written about the Beatles or about the man who has had perhaps the biggest hand in makeing the Fab Foue what they were, and still are? No one can deny Lennon's role in the Beatles' Fame. As a matter of fact, he more than once made sure the world realized his role was the most prominent among the four. Well, that's John Lennon for you. Singer par excellence, songweitee par excellence, performer par excellence and a hornet's nest stirrer par excellence.

There were various modes of infamy adopted by the music makers them : be it drugs, on and off the stage antics, differences blowing out of proportion, making over-the top statements, wow anizzing... you name it. Lennon was there and did that... and much more.

Let's start with his virtually leading the group. There was no denying, even in those days, as to who their frontman was. Even though he and Mc Cartney had been at loggeeheads over the songs written by them after their split, it is clear that Lennon remaind the principal singer and songwriter for the band. The pair agreed earlier to share the credits of creating the lyrics but in reality they directely collaberated on only a few of the Beatles' hits. Lennon, for his part was more experimental and mystical during the band's later years, while Mc Cartney was more pop-oriented.

It was also Lennon who is said to have actually led the group into drug use during the mid'60s. Mc Cartney! even though himself embroiled in his share of drug taking and possessing in his later years, was more controlled. It was again Lennon who got his mystical urges and encouraged the other there to follow his guru, Maharishi Mahesh Yogi, a phase that also helped them grab more headlines.

There was no denying the fact that lennon loved to scandalize. And it has been so since the time the group was in its infancy in Hamburg and Liverpool. Lennon was loud-mouthed and brash, and with a greasy hair do and old black leathers he had all the intention of attracting the populace with high shock value. At Hamburg's star club he would walk on stage naked except for a lavatory seat round his neck.

On Sundays, he would stand on a balcony and taunt passing churechgoers, including at times even downright obscenities. At one time, he tied a water-filled contraceptive sheath to a figure of christ and put it out for churchgoers to see. Sacrilege seemed poet of his very persona. As if that wasn't enough to infuriate people, he had much more such pranks, and dirtier ones to that, up his sleeve. On one instance our man,

standing on the balcony, urinated over the heads of there nuns. Lennon seems to have had this love— hate relation with religion in general and christ in particular. Why else would he then, during their heyday in the mid-sixties (60's), proclaim to the world that the Beatles 'are mare popular than Jesus Christ' resulting in a world-wide hostility to wards them, with many people destroying Beatles record in retaliation. There might be many who would have taken a step back with such reaction. Not our man John. He seemed to revel in the notoreity.

Leaving his frist wife Cynthia for Yoko Ono, he seemed to have got himself a partner-in-crime, if might turn it. Yoko too had a penchant for the scandalous. To cement their personal relationship, John and Yoko released their experimental 'found sound' collection unfinished Music, No. 1-Two virgins. The cover of this album featured a naked photo of the couple, causing it to be banned from many stores. Soon after, Lennon and a very pregnant Yoko embarked on a 'honeymoon' to Europe, stopping along the way to get married in Gibraltar where they stage a notorious 'Bed-In' at the Amsterdam Hilton. But things weren't all hunky-dory between John and Yoko and they had a brief Separation in 1974, following which Lennon, in the next two years relocated to Los angeles, got heavily involved in drugs, and became a frequent attendee of celebrity parties and wild night clubs. That's where he met Elton John, with whom he'd not just make music, but who'd be instrumental in bringing the couple back together.

Then, of course, there were the drugs, a constant companion for Lennon since the early days, especially during the time of Beatlemania when John feverishly experimented with heroin and cocaine as well as pot. In 1964, he began a crazy four- year drug binge that almost killed him. Lennon, had gone on record claiming that he 'went on LSD and must have had a thousand trips'. cynthia, his first wife, who had been with him in one such experience said that it was terrifying when they finally came out of it eight years later. She added that even though she vowed never to get into it again, John, according to her, had different plans as he found it wonderful. After the Beatles received their MoEs in 1965, John claimed that he and the others had smoked marijuana in the toilets at Buckingham Palace. As John got more and more into it, perhaps to escape from reality and what he and others thoughts would somehow improve their lives, little did he realize that it would eventually make life might marish, to say the least.

That dark day in New York, the music did die. As also much more.

वावला मन

मन में होती है खुशी
होठों पे आ जाती है हँसी
जब जब देखूँ तुम्हे ओ महजबी
तुम सा नहीं देखा कभी कभी॥
कहता है वावला मन मेरा कभी
प्यार से भी प्यारी है अदा तेरी॥
लगे तु परियों की शहजादी
ओ फुलो की डाली, मधुरस शहजादी॥
अब चाँद भी लगने लगा है मुझको पुराना
जब से देखा है मैने तेरा ये सुरत सुहाना॥

मेरी अभिलाषा

मेरी मौत भी न आयेगी चैन से।
और न जाएगी जब तक कशिश मन से॥
मंजिल तक पहुँच कर ही लूंगा दम हम।
कुछ भी हो, चलता ही रहुँगा हरदम हम॥
आओं लगा दे सब कुछ की वाजी।
न थकने को न रूकने को हो राजी॥
हमारी चुप भी खामोशी, चुप भी उदासी।
न हो निरथक, न सिर्फ एक मायूसी॥
जब करू मन मे चिन्तन न रहूँ अन्तर्मुखी से मलिन।
कमर बोझ से है लच-पच कैसे रहूँ पीड़ा मे तलिन।
जो हम सपनो में पाया अधूरा।
रूके न कदम हमारा जब तक न हो वह पुरा॥

Pitambar Jha Ajad
B. A. (G), 2nd Year
Roll - 405

मेरी अभीलाषा

संदीप कुमार यादव

चाह नहीं है, मुझे हीरे, सोने या
चाँदी की,
चाह नहीं है, मुझे आसमानों में चमकते
हुए तारो को पाने की,
चाह नही है, मुझे धरती पर हरे-भरे
जगमगाते हुए घास पर निन्दे भरने
की,
चाह नहीं है, मुझे पंक्षियों की
तरह नीले नीले बादलो में उड़ने की,
चहत है तो बस एक प्यारे से
मित्र की,
जो मेरी मित्रता की कीमत प्यार
से अदा कर सके।

Sandip Kr. Yadav
B. Sc. (G), 3rd Year

जो पूछता है कोई सुर्ख हैं आज आँखे क्यो,
तो आँख मलकर कहता हूँ रात सो न सका।
हजार चाहूँ मगर ये कह न सकूँगा,
रात रोने की ख्वाईश थी, मगर रो न सका॥

मैं हमेशा अपने गम को अपने आँसुओं में बहाने से डरता था,
कि कहीं कोई मुझे कमज़ोर न समझ ले।
पर क्या करें भावनाओं पर किसी का बस नहीं होता॥

मुहब्बत के खूबसूरत लम्हों को जीने के लिए,
कुछ पल ही काफी है।
किसी के दिल में जगह बनाने के लिए
एक मुलाकात ही काफी है॥
पर अब न जाने क्यों मुहब्बत के नाम से,
नफरत सी हो गई है।
और अब जब भी उसका ख्याल आता है तो फिर,
आँखों में आँसू आ जाते हैं।
उसकी बेवफाई पर, और दिल में बस,
एक ही आवाज आती है॥

मै मुहब्बत तू गुज़रा न कर अब मेरे दिल
के द्वार से,
अब मुझे नफरत सी होती है,
तेरे दीदार से॥

ओम प्रकाश मिश्रा
B. Sc., IIIrd Year
Roll - 365

खुशनसीब

रवीन्द्र तिवारी

पंडित गंगाधर द्विवेदी पूजा पर बैठे थे। रोज नित्य-नियम से पूजा उनकी जिन्दगी का एक हिस्सा बन चुकी थी।

बेटा फौजी था। चार महीने पहले ही कश्मीर में आतंकवादियों के गिरोह के पकड़ते-पकड़ते शहीद हुआ था। बहू तो विनय के ६ महीने बाद ही चल बसी थी। बस उनकी दुनिया में वही एक पोता था विनय। विनय पाँच साल का था और क्लास २ में आगरा शहर के माने-जाने सरस्वती-मन्दिर का स्टूडेन्ट था। हर काम में अपने दादा की हाथ बटाने की कोशिश करता। मगर दादा जी उसे हर बार यही कहकर टाल देते कि वो अभी बच्चा है। विनय भी खेलने में मशगूल हो जाता था। लेकिन एक बात उसे हमेशा

याद थी, वह है स्कूल का होमवर्क। बिना होमवर्क किए वह किसी फ्रेन्ड से न लिता। गर्मी की छुट्टियाँ होने वाली थी विनय दादा जी से एक बात रोज रटता था। दादा जी हम लोग नानी के घर कब जाएगें?

विनयबेटा लगता है इस बार हम लोग नहीं जा पाएगें।

पर क्यूँ दादा जी?

क्यूँ कि बेटा इस बार मुझे काम थोड़ा ज्यादा है।

विनय के दादा चुड़ि की फैक्ट्री के सुपरवाइजर थे। बेटे की मौत के बाद उन्हें मजबूर होकर ये रास्ता अपनाना पड़ा। फौजी बेटे के दम तोड़ते ही रोजगार का रास्ता बन्द हो गया। कोई व्यवसाय भी नथा जिससे घर-खर्च चलता। लिहाजा उन्हें ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। सुबह ऑफिस जाते तो विनय को स्कूल छोड़ देते और तीन बजे आते समय विनय को पिकअप कर लेते।

दादा जी अभी तो छुट्टी में महीनों बाकी हैं, तब तक तो काम फिनिश हो जाएगा।

नहीं बेटा बहुत काम है।

ब-हु-त - विनय मासूमियत से पूछा।

हाँ बेटा बहुत। कहते हुए दादा जी उसे बाहों में भर लिया और आलिंगन करने लगे।

दादा जी आप की दाढ़ी चुभती है। बहुत बड़ी है न इस लिए।

ठीक है तो फिर हम इसे छोटे करा लेगें। तब ठीक रहेगा न?

हाँ! विनय की मासूमियत देख दादा जो उसे दुलारने लगे।

दादाजी मैं छत पर जाऊँ?

क्यूँ?

पतंग उड़ाने?

नहीं बेटा! तुम तो उड़ा ही नहीं सकते फिर मैं अकेला कैसे जाने दूँ तुम्हें।

आप भी चलिए न दादा जी।

नहीं बेटे। मुझे ऑफिस का बहुत काम है।

आप को तो हर बार ब-हु-त काम रहता है जाइए।

मेरी आपकी कट्टी। विनय गुस्से से सर नीचे झुका लिया।

दादा जी कुछ न बोले। विनय अपने स्टडी रुम को ओर बढ़ा।

ठहरो विनय।

वह पीछे मुड़ गया। दादा जी ने उदास चेहरे पर मासूम सा गुस्सा देखा। थोड़े मुस्कराएँ और बोले। चलो।

विनय उछल पड़ा। उसकी खुशी देख दादा जी की आँखे भरते चली गई। चलो आज आप को पतंग उड़ाना सिखलाएगें। कहते हुए दादा जी झुक गए।

विनय उनके पीछे पीठ पर सवार हो गया।

दादा जी ने मांझा लिया और पतंग चल पड़े छत पर विनय के संग, उड़ाने।

थोड़ी ही देर में विनय की पतंग सबसे ऊपर उड़ने लगी।

विनय उसे देखकर बहुत खुश था। दादा जी एक बात पूँछू।

हाँ कहो दादा ने हाँ में सिर हिलाया।

दादा जी हमारे क्लास में सभी बच्चे कहते हैं वे नया-नया गेम जानते हैं। जानते हो उन्हें कौन सिखाता है?

दादा जी ने मासूमियत में कहा नहीं।

उनकी मम्मी। वियन बोला।

दादा जी चौंक से गए। कुछ न बोले।

दादा जी अचरज से विनय को देखने लगे। पतंग कट गई।

दादा पतंग तो कट गई। विनय बोला।

हाँ बेटे कट गई। सिर्फ डोर ही रह गई। पता नहीं कब ये भी छूट जाए। कहते हुए वे विनय को सीने से लगा लिए।

बताओं न दादा जी मम्मी कैसी होती है। आप हर बार कहते हैं वो बहुत दूर भगवान के पास गई हैं। मेरा मन उनको देखने को करता है। वो कब आएगी? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती। बताओं न दादा जी। एक साथ विनय ने कई सवाल कर डाले। दादा जी का कलेजा हर बार टुकड़ों-टुकड़ों में विनय के सवाल से बिखर गया। वे कुछ न कह सके। गला भर गया था। आँखे झलक रही थी। काँधते गले से बोले आएगी बेटा।

पर कब? ..... फिर सवाल मैंने कहा न जल्दी आएगी।

दादा जी पतंग तो बहुत ऊपर उड़ती हैं न?

हाँ बेटे, बहुत ऊपर उड़ती है।

फिर क्यूँ न इसी पर मम्मी को मैसेज लिखकर बुलवा ले।

हाँ बेटा हाँ। कहते हुए दादा ने विनय को छाती से चिपका लिया। और नीचे चले आए।

दादा जी रोज विनय को अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाते थे ताकि वह ऐसे ही उलझा रहे उन्हें डर था कहीं विनय फिर माँ का जिक्र न कर बैठे। वर्ना उनमें इतना साहस नहीं कि वो पाँच साल की बच्चे के आँखों में देखकर हकीकत बयां कर सके।

विनय के इक्साम्स खत्म हो चुके थे। उसे अब स्कूल से सवा महीने की छुट्टी मिल गईथी। दादा जी सोच रहे थे क्यूँ न इसे यहीं शहर में इसकी बुआ के यहाँ भेज दें। मगर विनय को वो जगह ही नहीं पसंद हैं। कहता है उसे वहाँ खेलने को नहीं मिलता, कोई उस का हम उम्र फ्रेन्ड नहीं है। इसलिए वह बोर हो जाता है। इस बार भी लगता है उसे नानी के यहाँ फैजाबाद ले जाना ही पड़ेगा। वर्ना उसका टाइम कैसे कटेगा। विनय-विनय कहते दादा जी, कमरे की तरफ बढ़े। विनय सो रहा था। चेहरे पर मासूमियत साफ चमक रही थी। उसे जगाना दादा जी ने मुनासिब न समझा। गाल पर हल्की सी चुम्मी ली और ऊपर चदर डालकर वहाँ से निकल आए। आते ही टेलीफोन उठाया और कम्पनी के मालकिन के पास फोन किया।

हैलो कौन? उधर से आवाज आई।

जी मैं गंगाधर द्विवेदी बोल रहा हूँ।

हाँ कहिएं द्विवेदी जी।

मैडम मुझे एक महीने की छुट्टी चाहिए।

पर क्यूँ?

मुझे अपने पोते को उसके नानी के यहाँ ले जाना है।

ठीक है आज शाम को हमारी वेडिंग इनवर्सरी है आप आईएगा वहीं बात कर लेगें।

जी बहुत अच्छा। कहकर द्विवेदी ने रिसीवर काट दिया।

शाम हो गई थी। दादा जी ने अपना स्कूटर पोंछा।

विनय को तैयार किया और मिस जायसवाल के घर पहुँच गए।

देखते ही मिस जायसवाल ने द्विवेदी जी को नमस्ते कहा।

बड़ा प्यारा बच्चा है किसा है? जायसवाल ने पूछा।

जी मेरा पोता है।

आप का? मिस जायसवाल ने अचरज से पूछा।

जी हाँ मेरा। दादा जी ने विनय की तरफ देखकर बोले। विनय इधर-उधर देख रहा था।

द्विवेदी जी की आँख भर गई। धीरे लहजे में बोले वो अब इस दुनिया में नहीं हैं।

ओ हो - आएम सॉरी। मिस जायसवाल बोली। लेकिन इनकी देखभाल?

जी मैं ही करता हूँ।

एक बात बोलूँ द्विवेदी जी। मिस जायसवाल बोली।

जी कहिए।

अगर आप बुरा न माने तो मैं इसे गोद लेलूँ। वैसे भी

मेरा कोई बच्चा नहीं है आप जानते हैं।

नहीं - मालकिन नहीं कहते हुए द्विवेदी ने विनय को गले से लगा लिया आँखे हलक गई। मेरे जीने का यही बस एक सहारा है मालकिन वर्ना मैं अपने बेटे के साथ कब का ही मर जाता। अब तो यही मेरी जिन्दगी है।

मिस जयसवाल भी भावुक हो गई। आँसू पोछते हुए बोली खाना खाकर ही जाइएगा।

द्विवेदी जी विनय को लेकर दूसरी तरफ बढ़े। जहाँ कम्पनी के दोस्त खड़े गप्पे मार रहे थे जो कुछ तो उनके इम उम्र थे तो कुछ छोटे।

थोड़ी देर बाद द्विवेदी जी विनय को लेकर खाने बैठ गए। ज्यादा तीखा खाना द्विवेदी जो को मना था डॉक्टर ने मना किया था क्यों कि उन्हें दमा था। रह-रहकर जोर की खाँसी आती थी। पर कई दिनों से काबू में थी। खाकर वे विनय के साथ घर आए। विनय सो रहा था। द्विवेदी जी विनय द्वारा उस दिन कही गई बातें सोच सोचकर रह रह कर खांसने लगते। रात बढ़ती गई। द्विवेदी जी की खांसी रात भर चलती रही। वे विनय को लेकर चिन्तित थे।

सुबह हुई विनय सिसक रहा था। दादा जी उठो न मुझे मम्मी से मिलना है। चलो पतंग पर मैसेज लिखकर भेजते हैं। मगर दादा जी खामोश आँख बन्द किए सोए थे। वे विनय के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। विनय उन्हें झिझोड़ रहा था। मगर दादा जी का सिर तकिए से नेचे लटक गया था। चेहरे पर मक्खियाँ भिनक रही थी। विनय खामोश खड़ा था। फिर वह जोर से चीखा और पड़ोस के घर पहुँचा। ..... ।

सुनामी

काटों पे चले तो ये जाना।
फूलों क डगर क्या होता हैं॥

सोना पड़ा फुटपातों पे तो।
जाना बिसतर क्या होता है॥

पैरों के तले अब पानी है।
सर पर नीला अम्बर ठैराह॥

जब देखा गिरी दिवारों को।
जाना के घर क्या होता है॥

जो लौट कर आऐं हैं जिन्दा।
जाकर के जरा उनसे पूछा॥

उनकी आखों में देखोगे के।
मौत क डर क्या होता है॥

न लगी कभी ठोकर जिनको
वो दर्द भला क्या जानेंगें।

जब चले पथरिली राहों पर।
जाना पत्थर क्या होता हैं॥

कल यही पे मैने देखा था
यह खड़ी थी राजमहल कोई॥

और आज यहाँ जब लौटें हैं।
जाना खंडर क्या होता है।

यूही राहोंपे चलते-चलते।
एक खोपड़ी पैरों से उलझी॥

जीस सर पर ताज सजाते है।
आखीर वो सर क्या होता है॥

ये कहर है उन लहरों का
जीसे हम सुनामी कहते हैं।

अब नाम से ही बस जिसके
बच्चें-बुढ़े सब डरते है।

कवीता

जो सपने हमने देखे थे
उन्हे पाने को जी करता है।

उन लम्हों में उन चादों में
डुब जाने को जी करता है।

तु जहाँ-जहाँ कदम रखे वहाँ
दिये जलाने को जी करता है।

तु जो कहदे तुम मेरी हों
मरजाने को जी करता है।

तेरी हर एक मुसकान पे
लुट जाने को जी करता है।

तेरे साथ एक नया जहाँ
बनाने को जी करता है॥

Tanveer Ahmed Khan
B.Sc. (Gen), 2nd Year
Roll - 211

COLLEGE LIBRARY
ESTD-1970

COLLEGE LIBRARY
ESTD.

"পথ এখনো শেষ হল না,
মিলায় এলো দিনের ভাতি।
তোমার আমার মাঝখানে হায়
আস্‌বে কখন্ আঁধার রাত্তি।
এবার তোমার শিখা আনি
জ্বালাও আমার প্রদীপ খানি,
আলোয় আলোয় মিলন হবে
পথের মাঝে, পথের সাথী।।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর